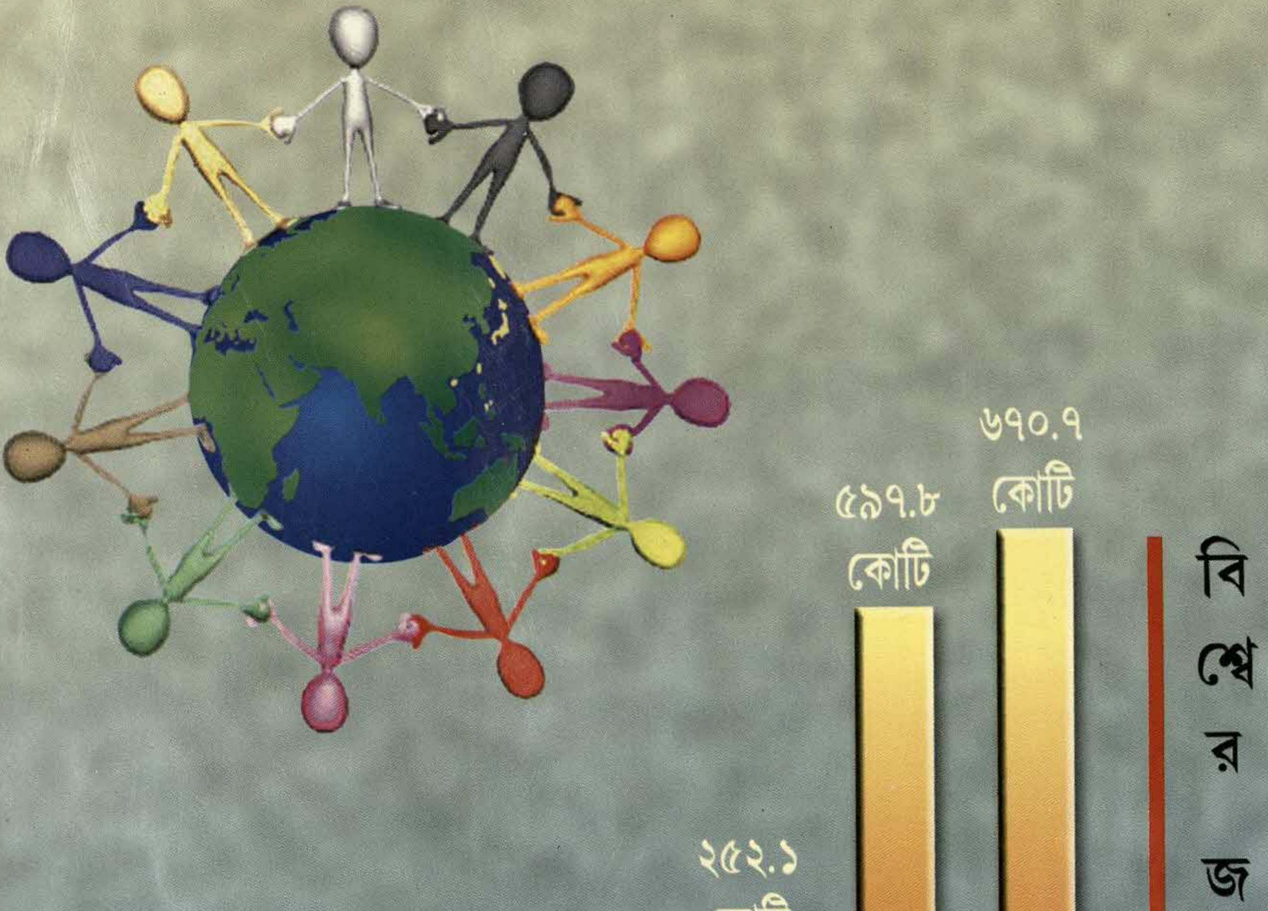
জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা

(প্রশিক্ষণ সহায়িকা)



রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
www.scertwestbengal.org

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা

(প্রশিক্ষণ সহায়িকা)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)
২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৯
www.scertwestbengal.org

" Janasampad Bishayak Siksha"

Training manual for orientation of Teachers on Population Education, adapted, translated and published by SCERT (WB) from the draft manual on Population Education prepared by NCERT under National Population Education Project.

প্রথম সংস্করণ : ৫ই নভেম্বর, ২০০৯

প্রকাশক : অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৯

মুদ্রক : হুগলী প্রিন্টিং কোম্পানী লিমিটেড
৪১, চৌরঙ্গী রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭১

सत्यमेव जयते

পার্থ দে
মন্ত্রী
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
☎ : (০৩৩) ২৩৩৪ ২২৫৬
(০৩৩) ২৩৫৮ ৮৮৫৮ (ফ্যাক্স)

নং ২৭৯/ম/স্মিঃএসটি (বি:)

তারিখ ৬.৬.০৮

প্রিয় শ্রীদে,

তরুণদের একটি নিজস্ব, আত্মবিশ্বাসী, সচেতন জীবনশৈলী প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে । বিদ্যালয় শিক্ষার পর্যায়ে তাদের রুচি, অভ্যাস ও রীতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শক্তি অর্জন করবে । মানব কল্যাণ-এর সংগে পরিবার, শিশু, নারী ও প্রান্তবর্তীদের সংযোগ, প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের সম্যক সমন্বয় ও আসন্ন বয়ঃপ্রাপ্তিকে গ্রহণ করার প্রস্তুতিই হবে এই অনুশীলনের প্রধান অভিমুখ ।

যে শিক্ষা সম্ভারটি উপস্থাপিত করা হয়েছে সেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক।

সকলের জন্য বিশেষতঃ শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের জন্য অভিনন্দন রইল।

পার্থ দে

(পার্থ দে)
৬/৬/২০০৮

শ্রী রথীন্দ্র নাথ দে
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

প্রস্তাবনা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)-এর (এস.সি.ই.আর.টি) পরিচালনায়, ইউ.এন.এফ.পি.এ-র আর্থিক সহায়তায় এবং জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন.সি.ই.আর.টি)-এর সাহায্যে ১৯৮৪ সালে শুরু হয় জাতীয় জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা প্রকল্প। সেই সময় থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের জন্য ইউ.এন.এফ.পি.এ- থেকে আর্থিক অনুদান বন্ধ হলে ৩১-১২-২০০২ তারিখে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নতুন প্রকল্প হিসাবে ২০০৪ সাল থেকে বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্প পুনরায় চালু হয়েছে। নতুন আঙ্গিকে আমাদের রাজ্যে এই প্রকল্পটি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। জনসংখ্যার সঙ্গে ধারণযোগ্য উন্নয়ন; লিঙ্গসমতা ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন; জীবনশৈলী শিক্ষা; পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং নগরায়ন ও অভিবাসনের সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষক অভিমুখীকরণের জন্য রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পক্ষ থেকে "জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা" শীর্ষক এই পুস্তিকা ২০০৯-১০ সালে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আশা করা যায়, এই অভিমুখীকরণের ফলে শিক্ষকেরা মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানের সময় জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলির ধ্যানধারণা সংযোজিত করে পাঠদান করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে জীবনের নানা বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়। বিদ্যালয় পাঠক্রমে নতুন কোনো বিষয় সংযোজন না করা এস.সি.ই.আর.টি- প্রস্তাবিত "জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা" প্রকল্পের গৃহীত নীতি।

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও রূপায়ণের রূপরেখা আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যস্তরের নানান চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা হল একটি শিখন প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের জনসংখ্যা ও উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক, জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল এবং জনসংখ্যার স্থিতাবস্থার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ মনোভাব ও দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলে, যাতে তারা পরবর্তী জীবনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই ধারণাই প্রাধান্য পাচ্ছে যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণাগুলি সম্পর্কে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধান পদক্ষেপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে এন.সি.ই.আর.টি নতুন আঙ্গিকে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষায় ছয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছে, সেগুলি হল-

★ জনসংখ্যা ও ধারণযোগ্য উন্নয়ন
★ লিঙ্গসমতা ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন
★ জীবনশৈলী শিক্ষা
★ পরিবার ঃ আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ ও জীবনমান
★ স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা - জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নির্ধারক
★ জনসংখ্যা বন্টন ঃ নগরায়ন ও অভিবাসন

জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষার অন্তর্গত উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃবঃ)-এর পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রণীত এ সংক্রান্ত খসড়া প্রশিক্ষণ সম্ভারের পরিবর্তন, পরিমার্জন করে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হল। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাতে উপরোক্ত ছয়টি বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিক তথ্য সম্বলিত বিশদ আলোচনা রয়েছে।

''জনসংখ্যা ও ধারণযোগ্য উন্নয়ন'' শীর্ষক অধ্যায়ে পরিবেশ, সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনীতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

''লিঙ্গ সমতা ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন'' শীর্ষক অধ্যায়ে লিঙ্গ অসাম্যের নানা দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন কিভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা রয়েছে।

''জীবনশৈলী শিক্ষা'' শীর্ষক অধ্যায়ে বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের পরিবারে ও সমাজে যথাযথভাবে জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে নানা জীবনদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন দক্ষতা যথা আত্মউপলব্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপ্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান, মত প্রকাশের দৃঢ়তা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চাপ সহ্য করা, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে। এই দক্ষতাগুলি কিভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা এই অধ্যায়ে রয়েছে। এই সকল জীবনদক্ষতাগুলি অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাজের নমুনাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

''পরিবার ঃ আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ ও জীবনমান'' শীর্ষক অধ্যায়ে পরিবারে সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ, দায়িত্বশীল পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও পরিবারের আয়তন রক্ষার্থে পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

''স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা-জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নির্ধারক'' শীর্ষক অধ্যায়ে বিভিন্ন নির্দেশকগুলি সম্পর্কে, ভারতের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুহার, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার পরিবর্তনের সম্পর্ক, জনসংখ্যা পরিবর্তনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, মা ও শিশুর যত্ন, মহিলাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য কি কি পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

''জনসংখ্যা বণ্টনঃ নগরায়ন ও অভিবাসন'' অধ্যায়ে বিশ্বস্তরে উন্নয়নের ওপর নগরায়নের প্রভাব, ভারতবর্ষে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উন্নয়ন ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ, কেন্দ্রীভূত নগরায়নের প্রভাব, ভারতবর্ষে নগরায়নের সঙ্গে আর্থিক, সামাজিক ও গণপরিসংখ্যানগত উন্নয়নের সূচকের হ্রাসবৃদ্ধি, নগরায়নের ফলশ্রুতি, নগরায়নের সঙ্গে অভিবাসনের সম্পর্ক ও কারণসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ন ও নগরোন্নয়নের প্রচেষ্টার বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির (২০০১-০৩) সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ''জীবনশৈলী'' শিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করেছে।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পক্ষ থেকে ২০০৫-০৬ শিক্ষা বর্ষে রাজ্যের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কর্মসূচিটিকে আরও ব্যাপক করার জন্য ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে এটি পালনের সময় বাড়িয়ে তিনমাস করা হয়েছিল।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)-এর পক্ষ থেকে জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত বিষয়গুলি সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ করবার জন্য ''প্রত্যয়'' নামে একটি ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

এন.সি.ই.আর.টি.-র জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষার খসড়া প্রশিক্ষণ সম্ভারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারী সকল গুণীজনদের পরামর্শে এই পুস্তিকার সংকলন সম্ভব হল।

''জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা'' সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পুস্তিকাটির সম্পাদনার জন্য আমরা অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ডঃ গৌরীপদ দত্ত, শ্রীমতি সুলগ্না চক্রবর্তীর কাছ থেকেও এই প্রশিক্ষণ পুস্তিকাটি সমৃদ্ধ করার জন্য মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। অধ্যাপক প্রশান্ত রায় এই পুস্তিকার প্রকাশনার কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এন.সি.ই.আর.টি-এর অধ্যাপক জে.এল.পান্ডে এবং অধ্যাপিকা সরোজ যাদবকে তাদের তৈরী করা খসড়া প্রশিক্ষণ পুস্তিকাটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এন.সি.ই.আর.টি.-র আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পের যাবতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী দীননাথ সেন, শ্রীমতী তপতী গোস্বামী, অধ্যাপিকা সুজাতা রাহা, অধ্যাপিকা অপর্ণা চক্রবর্তী, শ্রী লক্ষীনারায়ণ রায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্না লাহিড়ীকে — যাদের সাহায্যে এন.সি.ই.আর.টি.-র খসড়া পুস্তিকাটির বাংলায় অনুবাদ করা হল।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের আধিকারিক শ্রীহীরক কুমার বারিক, শ্রীমতি অনসূয়া রায়চৌধুরী, শ্রীমতি ঊর্মি চক্রবর্তী, শ্রীমতি শ্রীদেবী দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতি মহুয়া চ্যাটার্জী এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা সম্পাদনায় কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের মতামত অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন ক্রমে এই সহায়িকা পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল। এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যাপক পার্থ দে, মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি সম্বন্ধে পরামর্শ ও মূল্যবান মতামত দিয়েছেন এবং প্রকল্পের প্রধান অভিমুখ নির্দেশ করেছেন। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীকে জানাই বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পরিচালনায় জনসম্পদ বিষয়ক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই পুস্তিকা ব্যবহৃত হবে। এই পুস্তিকাটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নতুন চিন্তাভাবনায় সহায়ক হলে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের প্রয়াস সার্থক হবে।

এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে এর গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আগ্রহী গুণীজনদের কাছ থেকে মতামত পেলে আমরা উপকৃত হব।

কলকাতা
৫ নভেম্বর ২০০৯

রথীন্দ্রনাথ দে
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	জনসংখ্যা এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন	১ - ১৬
২.	লিঙ্গসমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন	১৭ - ৩৩
৩.	জীবনশৈলী শিক্ষা	৩৪ - ৫৮
৪.	পরিবার ঃ আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ ও জীবনমান	৫৯ - ৬৯
৫.	স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা- জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নির্ধারক	৭০ - ৮৮
৬.	জনসংখ্যা বন্টন ঃ নগরায়ন .ও অভিবাসন	৮৯ - ১১৩

প্রথম অধ্যায় | জনসংখ্যা এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন

১২ই আগস্ট ১৯৯৯ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৬০০ কোটি। ২০২৫ সাল নাগাদ এটা বেড়ে দাঁড়াবে ৮৫০ কোটি। ২০৫০ সালে হতে পারে ১০০০ কোটি। প্রতিবছর ৮ কোটি ৫০ লক্ষ হারে বাড়ছে জনসংখ্যা। এর মধ্যে ভারতে বাড়ছে প্রতিবছর ১ কোটি ৮০ লক্ষ করে। আবার, আয়ুও বাড়ছে, নগরায়ন বাড়ছে, বেশ বেড়ে চলেছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা।

বৃহৎ জনসংখ্যা জীবনমানের উপর প্রভাব ফেলে, কারণ খাদ্য, পোশাক, গৃহ ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো বেশি মানুষের জন্য যোগান দিতে হয়। যেমন, মোট খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু মাথা পিছু যোগান চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। তেমনি নগরায়নের প্রসার ঘটলে বাড়তি নাগরিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়। পরিবেশের মান যথাযথ রাখার দায়িত্বও বাড়ে। বয়স্ক মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি তাদের ভরণপোষণের সমস্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তার মানে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেক বেশি মানুষের দায় নিতে হচ্ছে। বেশি দিন বাঁচা মানে তো বেশি দিন সম্পদ ভোগ করা।

বিশ্বের উন্নয়নশীল বড় অংশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। তবে বিশ্বের উন্নত অংশে মাথা পিছু সম্পদ ভোগের হার উন্নয়নশীল অংশ থেকে ১৫ গুণ বেশি। কাজেই ধারণযোগ্য উন্নয়নের প্রশ্নে মাথা পিছু সম্পদ ভোগের বিষয়টি বিবেচ্য। উন্নয়নকে ধারণযোগ্য করার জন্য এখন যেটা দরকার সেটা হল এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া যাতে জনসংখ্যাকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমিত রাখা যায়। অপরদিকে সম্পদের উন্নততর ব্যবহার ও পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কীভাবে সম্পদের ব্যবহার হয় এবং এই দুটির সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তা নির্ভর করে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধের ওপর।

ধারণযোগ্য উন্নয়ন কী?

বৃদ্ধি বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আকারগত বিস্তার। উন্নয়ন বলতে বোঝাবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক বিস্তারের গুণগত পরিবর্তন। বৃদ্ধি একটি প্রক্রিয়া যার সুফল সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছয়—এমন একটি ধারণা দীর্ঘদিন চালু ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে অন্য কথা। তাই বৃদ্ধি-র ধারণার জায়গায় এসেছে উন্নয়ন-এর ধারণা। এর প্রকৃত অর্থ হল সামাজিক ন্যায় ভিত্তিক বৃদ্ধি। তাই বিশ্বকে কেবল বড় হলে চলবে না, বিশ্বকে উন্নত হতে হবে। বিকাশ কেবল বহিরঙ্গের পরিবর্তনের স্বার্থে হবে না, এর সামাজিক দিকটিও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হবে।

বৃদ্ধিকে উন্নয়নে রূপান্তরিত করতে গেলে দরকার হবে একগুচ্ছ জনমুখী সরকারি নীতি। এই নীতিগুলিতে বিশেষ জোর দিতে হবে মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সমাজের দুর্বল অংশকে সক্ষম করে তোলার ওপর।

উন্নয়ন গঠন করে দেবে ব্যক্তিগত উন্নতির সহায়ক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো। উন্নয়নের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়বে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মসৃণগতি রাজনৈতিক সংগঠন ও সরকারি প্রশাসন, জনসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং সামাজিক সাম্য। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (১৯৯৫) ব্যক্তিগত উন্নতির সংজ্ঞায় দিয়েছেন তিনটি অপরিহার্য বিষয়—

১। সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ,

২। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুযোগগুলোর ধারাবাহিক প্রসার,

৩। মানুষের সক্ষমতা এমন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যাতে সবাই উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং উন্নয়নের সুফলও পেতে পারে।

তাছাড়া গৃহে এবং সমাজের সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সর্বজনস্বীকৃত সমানাধিকারও এই সংজ্ঞায় আছে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়া হল সামাজিক, শারীরবৃত্তীয়, অর্থনৈতিক—এই তিনটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন। সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়াও হবে স্থায়িত্বশীল।

১৯৮৭ সালে Burdtland কমিশন বুঝিয়ে দিলেন—এই উন্নয়ন বর্তমানের প্রয়োজন মেটাবে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। এভাবে একটি সমাজ তার ধারণযোগ্য উন্নয়নের পথ খোঁজে। সম্পদ ব্যবহারের মাত্রা এমন হবে যা সেই সম্পদের ঘাটতি পূরণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে না। নবীকরণযোগ্য নয় এমন সম্পদ ব্যবহার সেভাবেই করা দরকার যাতে নবীকরণযোগ্য সম্পদ দিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করা যাবে। তাছাড়া পরিবেশের দূষণমাত্রা পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবে না। ধারণযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যপরিষেবা, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণের উপর গুরুত্ব থাকা চাই কারণ এগুলো জনসংখ্যার হারকে স্থিতিশীল করার পক্ষে জরুরি।

১৯৯৪ সালে International Conference on Population and Development (ICPD) তাঁদের কর্মসূচিতে ধারণযোগ্য উন্নয়ন বলতে বোঝালেন মানব কল্যাণের সেই পন্থা যেখানে সুফল বর্তমানে এবং আগামীদিনে সমতার ভিত্তিতে ভাগ করে নেবে। এর জন্য দরকার জনসংখ্যা, সম্পদ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় সাধন করা। ধারণযোগ্য উন্নয়নে পৌঁছাবার জন্য এবং প্রত্যেকের জীবনমান উন্নততর করার জন্য রাষ্ট্রগুলোকে কমিয়ে আনতে হবে অনাবশ্যক উৎপাদন ও অতিরিক্ত ভোগের পরিমাণ, উপযুক্ত জনসংখ্যা নীতিকে তুলে ধরতে হবে যাতে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটে, আবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে (UNFPA 1995)।

মূল কথা

- উন্নত জীবনমান লোকসংখ্যার স্থিতিশীলতা আনতে পারে।
- তার জন্য চাই উন্নয়ন এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন।
- উন্নয়ন কিন্তু কেবলমাত্র বৃদ্ধি নয়।
- উন্নয়ন বলতে বোঝাবে প্রয়োজনীয় সম্পদবৃদ্ধি এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দেশের সম্পদ ভোগের সমানাধিকার।
- উন্নয়নের জন্য চাই সম্পদের পরিমিত ভোগ, উৎপাদন ব্যবস্থায় নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার।
- পরিবেশ, সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-এগুলোর সামঞ্জস্যসাধন না হলে উন্নয়ন ধারণযোগ্য হবে না।
- ধারণযোগ্য উন্নয়নের সূচক হবে—পরিবেশের সংরক্ষণ, সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, খাদ্য, আশ্রয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা।

ধারণযোগ্য উন্নয়নের সংজ্ঞায় আরও কিছু বিষয় উঠে আসছে। এই উন্নয়ন বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যাতে অর্থনীতি-পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং ব্যক্তিসমাজ – এসব কিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রদত্ত আর্থিক অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতেও বজায় রাখা যায় এমন ধরনের জীবনমানের ওপর এই উন্নয়নের দৃষ্টি থাকবে।

জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি এক এক দেশের এক এক রকম। এই দেশগুলিকে মোটামুটি ধনী ও গরিব — এই দুই সহজভাগে ভাগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশের নানাবিধ পরিস্থিতি আছে। ধারণযোগ্য উন্নয়নের আলোচনায় সেগুলি প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

ধারণযোগ্য উন্নয়ন গ্রাম ও মহানগরের ক্ষেত্রে একই অর্থ বোঝায় না। সাধারণভাবে ধারণযোগ্য উন্নয়নের নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্রা এখানে আলোচিত হচ্ছে।

মানবিক দিক

একই গ্রহে আমাদের বাস, কিন্তু অনেকগুলি জগৎ। আছে প্রাচুর্যের (এবং তার ফলে দূষণের) বিশ্ব, আছে অভাবের (এবং তার ফলে নিম্নমানের জীবনের) বিশ্ব। অনিবার্য বাস্তবতা এই যে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা যদি প্রদত্ত হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার মত যথেষ্ট সম্পদ পৃথিবীতে আছে। তাই জনসংখ্যা, জীবনশৈলী এবং সম্পদ ব্যবহারের মাত্রা, সম্পদের নবীকরণ এবং সংরক্ষণ এগুলির মধ্যে একটি বা একাধিক সম্পর্কের ভারসাম্য যদি নষ্ট হয় তাহলে এ গ্রহের আয়ু কমে আসবে। ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য দরকার জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাপ পড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর এবং জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ওপর।

আসুন, দেখে নিই বিশ্বের এবং জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যার কী অবস্থা।

বিশ্বস্তরে জনসংখ্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্ব দেখল স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি। Wikipedia (World Population) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী —

১৭৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	৭৯.১ কোটি
১৮০০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	৯৭.৮ কোটি
১৮৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	১২৬.২ কোটি
১৯০০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	১৬৫.০ কোটি
১৯৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	২৫২.১ কোটি
১৯৯৯ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	৫৯৭.৮ কোটি
২০০৮ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল	৬৭০.৭ কোটি
২০৫০ সালে সম্ভাব্য বিশ্ব জনসংখ্যা হবে	৮৯০.৯ কোটি
২১৫০ সালে সম্ভাব্য বিশ্ব জনসংখ্যা হবে	৯৭৪.৬ কোটি

এখন বিশ্বজনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতির দিকে। এই হ্রাসের কারণ জনন ক্ষমতার হার কমে যাওয়া। এখন বিশ্বে জননী পিছু সন্তানের হার ২.৬৮। বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার ১০০০ পিছু ৫৫, একদশক আগে এটা ছিল ১০০০ পিছু ৬৬।

প্রত্যাশিত আয়ু বেড়ে হয়েছে গড়ে ৬৩.৯ (পুরুষ), ৬৮.১ (মহিলা)।

এখানেও উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে ফারাক আছে। সেটাই নীচের ছকে দেখুন।

ছক ১.১ ঃ গণ পরিসংখ্যান চিত্র ঃ ভারত ও বিশ্ব

অঞ্চল/ দেশ	মোট জনসংখ্যা কোটি (২০০২)	বৃদ্ধির হার % (২০০০-০৫)	মোট জনন হার (২০০০-০৫)	শিশু মৃত্যুর হার (২০০০-০৫)	আয়ুষ্কাল (বছর হিসাবে)	
					পুরুষ	মহিলা
বিশ্ব	৬২১.১১	১.২	২.৬৮	৫৮	৬৩.৯	৬৮.১
বেশি উন্নত দেশ	১১৯.৬০	০.২	১.৫০	৮	৭১.৯	৭৯.৩
কম উন্নত দেশ	৫০১.৫১	১.৫	২.৯২	৫৯	৬২.৫	৬৫.৭
এশিয়া	৩৭৬.৮৬	১.৩	২.৫৪	৫৩	৬৫.৮	৬৯.২
ভারত	১০২.৭৬	১.৫৫	৩.০৪	৬৩.১৯	৬২.২২	৬৩.৫৩

(সূত্র ঃ The State of World Population 2002, UNFPA)

১.২ নং ছকে দেখুন জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের ১০টি দেশে ২০০২ ও ২০৫০ সালের জনসংখ্যা কত হচ্ছে। এই প্রতিচিত্র তুলে ধরার জন্য রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা দপ্তর ভবিষ্যতের প্রজনন ক্ষমতা, মৃত্যুহার, বাসস্থান বদল প্রভৃতির আনুমানিক গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করেছে, কারণ ভবিষ্যতের পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

ছক ১.২ ঃ জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে প্রথম দশটি দেশ

২০০২		২০৫০	
দেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	দেশ	জনসংখ্যা প্রতিচিত্র (কোটি)
১। চিন	১২৯.৪৪	১। চিন	১৪৬.২১
২। ভারত	১০৪.১১	২। ভারত	১৫৭.২১
৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৮.৮৫	৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৯.৭১
৪। ইন্দোনেশিয়া	২১.৭৫	৪। ইন্দোনেশিয়া	৩১.১৩
৫। ব্রাজিল	১৭.৪৭	৫। ব্রাজিল	২৪.৭২
৬। রাশিয়া	১৪.৩৮	৬। রাশিয়া	১০.৪৩
৭। জাপান	১২.৭৫	৭। জাপান	১০.৯২
৮। পাকিস্তান	১৪.৮৭	৮। পাকিস্তান	৩৪.৪২
৯। বাংলাদেশ	১৪.৩৪	৯। বাংলাদেশ	২৬.৫৪
১০। নাইজিরিয়া	১২.০০	১০। নাইজিরিয়া	২৭.৮৪

(সূত্র ঃ The State of World Population 2002, UNFPA)

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে জনবিন্যাসে বিশেষ পার্থক্য আছে। উভয় এলাকার নীতি ও কর্মসূচীতে এর গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য থাকে।

উন্নয়নশীল দেশে ৩৫% মানুষের বয়স ১৫ বছরের নীচে। তাদের জন্য চাই আরও স্কুল, আরও পরিষেবা যাতে শিশুরা তাড়াতাড়ি যুবক হয়ে উঠে উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে পারে।

অপরদিকে উন্নত দেশে মাত্র ১৯% হচ্ছে ১৫ বছরের নীচে, ১৪% ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব। এই এলাকায় বয়স্কদের প্রয়োজন মেটানোর উপর গুরুত্ব দিতে হচ্ছে।

বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে এখনো কম বয়সি মানুষ অনেক কিন্তু বিশ্বে বয়স্কদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। বিশ্বের মানুষের গড় বয়স ১৯৭০ সালে ছিল ২১.৬। এটা ধীরে ধীরে একটু করে বাড়ছে। ১৯৮০ সালে গড় বয়স হল ২২.৬, ১৯৯০ সালে ২৪.২ এবং ১৯৯৯ সালে হল ২৫।

ভারতের জনসংখ্যার প্রবণতা

২০০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০৩ কোটি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারত। ভারত প্রতিবছর ১ কোটি ৮০ লক্ষ করে জনসংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার সঙ্গে যোগ করে দেয়। নীচের ১.৩ (ক) ছক ভারতে জনসংখ্যার চিত্রটি তুলে ধরেছে।

ছক ১.৩ ঃ ভারতের জনসংখ্যাচিত্র (১৯৫০ - ২০০৫)

	১৯৫০-'৫৫	১৯৭০-'৭৫	১৯৯০-'৯৫	২০০০-'০৫
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.০০	২.২৪	১.৯৩	১.৫৫
জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)	৪৫.৪	৩৮.৮	৩০.১	২৪.৬
মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)	২৫.৪	১৫.৯	১০.৪	৮.০০

ছক ১.৩ (ক) ঃ ভারতের জনসংখ্যা (১৯০১ - ২০০১)

বছর	জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)	পর পর ১০ বছরে বৃদ্ধির হার (শতকরা হিসাবে)	গড় বাৎসরিক হিসাবে বৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
১৯০১	২৩.৮৪	—	—
১৯১১	২৫.২১	+ ৫.৮	০.৫৬
১৯২১	২৫.১৩	− ০.৩	−০.০৩
১৯৩১	২৭.৯০	+ ১১.০	১.০৪
১৯৪১	৩১.৮৭	+ ১৪.২	১.৩৩
১৯৫১	৩৬.১১	+ ১৩.৩	১.৩৫
১৯৬১	৪৩.৯২	+ ২১.৫	১.৯৬
১৯৭১	৫৪.৮২	+ ২৪.৮	২.২০
১৯৮১	৬৮.৩৩	+ ২৪.৭	২.২২
১৯৯১	৮৪.৬৩	+ ২৩.৫	২.১১
২০০১	১০২.৭০	+ ২১.৩	১.৭৩

(সূত্র ঃ Census of India 1991-2001 and UN Estimation Population of India - 2001 Census Result & Methodology by Ashish Bose.)

ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার ১৬ শতাংশ। এদের বাসভূমি বিশ্বের ২.৪ শতাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। তবু ৩৬ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫ বছরের নীচে। কম বয়সে বিবাহ ও কম বয়সের সন্তানের জন্ম ইত্যাদির ফলে শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু হার বিপুল।

ভারতের জনবিন্যাস বৈচিত্র্যে ভরা। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি সাধারণ তুলনা জনবিন্যাসের মৌলিক সূচকগুলির বিরাট পার্থক্য দেখিয়ে দেয়, যা কর্মসূচি ও কার্যধারা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের রেজিষ্ট্রার জেনারেল ২০০১ সালের রিপোর্টে বৃদ্ধির হারের একটা তথ্য দিয়েছেন। ৪টি রাজ্যের জনবিন্যাস বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলো হল

১। বিহার ২। মধ্যপ্রদেশ ৩। রাজস্থান ৪। উত্তর প্রদেশ।

এই ৪টি রাজ্যে জন্মহার সর্বোচ্চ এবং তার ফলেই এদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আবার কেরালা ও তামিলনাড়ুতে জন্মহার সর্বনিম্ন। মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যাতে মৃত্যুহার সর্বাধিক। এই চারটি রাজ্যের উপর গুরুত্ব পড়বে সবচেয়ে বেশি কারণ চার রাজ্যের জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। হিসাব মতো কয়েক বছর এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

ছক ১.৪ ঃ প্রধান রাজ্যগুলিতে জন্মহার ও স্বাভাবিক বিকাশের হার — (১৯৯৯)

	ভারত / রাজ্য	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	স্বাভাবিক বিকাশহার (শতকরা হিসাবে)
	ভারত (২০০১)	২৪.২৮	৪.৭৪	১.৫৫
১.	উত্তর প্রদেশ	৩২.১	১০.৫	২.১৬
২.	রাজস্থান	৩১.১	৮.৪	২.২৭
৩.	বিহার	৩০.৪	৯.১	২.১৪
৪.	মধ্যপ্রদেশ	৩০.৭	১০.৬	২.০১
৫.	আসাম	২৭.০	৯.৭	১.৭৩
৬.	হরিয়াণা	২৬.৮	৭.৭	১.৯১
৭.	উড়িষ্যা	২৪.১	১০.৬	১.৩৪
৮.	গুজরাট	২৫.৪	৭.৯	১.৭৬
৯.	হিমাচল প্রদেশ	২৩.৮	৭.৩	১.৬৪
১০.	পাঞ্জাব	২১.৫	৭.৪	১.৪১
১১.	মহারাষ্ট্র	২১.১	৭.৫	১.৩৬
১২.	অন্ধ্রপ্রদেশ	২১.৭	৮.২	১.৩৫
১৩.	কর্ণাটক	২২.৩	৭.৭	১.৪৩
১৪.	পশ্চিমবঙ্গ	২০.৭	৭.১	১.৩৬
১৫.	তামিলনাড়ু	১৯.৩	৮.০	১.১৩
১৬.	কেরালা	১৮.০	৬.৪	১.১৬

(সূত্র ঃ Vital Statistics SRS 1996, Ashish Bose, Population of India 2001 Census Result and Methodology, Delhi, 2001)

১.৫ নং ছকে আমরা আর একটি স্পর্শকাতর দিকের নির্দেশ পাই। শিশুমৃত্যুর হারের চিত্র কয়েকটি রাজ্যে বেশ উদ্বেগজনক। উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে এই হার ১০০ (প্রতি হাজারে)।

ছক ১.৫ ঃ গ্রামাঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার (১৯৯৫-৯৯)

	স্থান ভারত / রাজ্য	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
	ভারত	৮০	৭৭	৭৭	৭৭	৭২
১.	মধ্যপ্রদেশ	১০৪	১০২	৯৯	১০৩	৯৬
২.	উড়িষ্যা	১০৭	৯৯	১০০	১০১	১০০
৩.	উত্তরপ্রদেশ	৮৯	৮৮	৮৯	৮৯	৮৭
৪.	রাজস্থান	৯০	৯০	৮৯	৮৭	৮৫
৫.	আসাম	৭৮	৮৯	৮৯	৮২	৭৯
৬.	অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৪	৭৩	৭০	৭৫	৭৫
৭.	হরিয়াণা	৭০	৭০	৭০	৭২	৭০
৮.	গুজরাট	৬৮	৬৮	৬৯	৭১	৭০
৯.	কর্ণাটক	৬৯	৬৩	৬৩	৭০	৬৯
১০.	বিহার	৭৪	৭৩	৭৩	৬৮	৬৭
১১.	হিমাচল প্রদেশ	৬৩	৬৩	৬৪	৬৬	৬৩
১২.	মহারাষ্ট্র	৬৬	৫৮	৫৬	৫৮	৫৮
১৩.	পাঞ্জাব	৫৮	৫৪	৫৪	৫৮	৫৭
১৪.	তামিলনাড়ু	৬১	৬০	৫৮	৫৮	৫৮
১৫.	পশ্চিমবঙ্গ	৬১	৫৮	৫৮	৫৬	৫৫
১৬.	কেরালা	১৬	১৩	১১	১৫	১৪

(সূত্র ঃ Registrar General, India, SRS Bulletin, October 1999, Vital Statistics, SRS, 1999)

জনতত্ববিদরা মনে করেন জনসংখ্যা বিচারের মাপকাঠি হিসাবে মোট জন্মহারের চেয়ে মোট জননক্ষমতা বেশি উপযোগী। মোট প্রজননক্ষমতার মানে হচ্ছে জন্মদানের বর্তমান ধারার ভিত্তিতে মহিলাদের সন্তানধারণের বয়সকালে জননী পিছু সন্তান প্রসবের সংখ্যা।

ছক ১.৬ ঃ মোট জনন ক্ষমতার হার, ১৯৮৮-৯৯ (১৫-৪৯ বছরের মহিলাদের ক্ষেত্রে)

	রাজ্য	শহর	গ্রাম	মোট
১.	উত্তরপ্রদেশ	২.৮৮	৪.৩১	৩.৯৯
২.	রাজস্থান	২.৯৮	৪.০৬	৩.৭৮
৩.	বিহার	২.৭৫	৩.৫৮	৩.৪৯
৪.	মধ্য প্রদেশ	২.৬১	৩.৫৬	৩.৩১
৫.	হরিয়ানা	২.২৫	৩.১৩	২.৮৮
৬.	গুজরাট	২.৩৩	৩.০১	২.৭২
৭.	মহারাষ্ট্র	২.২৫	২.৭৪	২.৫২
৮.	ওড়িষ্যা	২.১৯	২.৫০	২.৪৬
৯.	আসাম	১.৫০	২.৩৯	২.৩১
১০.	পশ্চিমবঙ্গ	১.৬৯	২.৪৯	২.২৯
১১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	২.০৭	২.৩২	২.২৫
১২.	পাঞ্জাব	১.৭৯	২.৪২	২.২১
১৩.	তামিলনাড়ু	২.১২	২.২২	২.১৯
১৪.	হিমাচল প্রদেশ	১.৭৪	২.১৮	২.১৪
১৫.	কর্ণাটক	১.৮৯	২.২৫	২.১৩
১৬.	কেরালা	১.৫১	২.০৭	১.৯৬

সূত্র ঃ Compiled from preliminary report of NFHS-2, 2000, (International Institute for Population Sciences, Bombay, 2000)

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রে ৪টি বিশেষ সময়কাল আছে।

১ম ১৯০১-২১। এসময় জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল। জন্মহার এবং মৃত্যুহার ছিল বেশ উচ্চ (প্রতি হাজারে ৪৫)।

১৯২১। এই বছরটা ভারতের জনবিন্যাসের ইতিহাসে একটি বড় কালবিভাজিকা। এবছর থেকে মৃত্যুহার কমতে শুরু করে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়তে শুরু করে।

২য় ১৯২১-৫১-এই তিনটি দশককে বলা যেতে পারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্ব যখন থেকে বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৪১-৫১ এই সময়ে বৃদ্ধিহার একটু কম থাকে অংশত ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণে এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগ জনিত বিপর্যয়ের জন্য।

৩য় ১৯৫১-৮১ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসের ৩য় পর্ব যখন বৃদ্ধির হার বছরে ২ শতাংশ ছাপিয়ে যায়। তার কারণ স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাস্থ্য নীতির সাফল্যের কারণে মৃত্যুহার বেশি করে কমে আসে। ১৯৬১-৮১ বাৎসরিক বৃদ্ধির হার হয় সর্বাধিক (২.২%)।

১৯৭১-৮১ সাল জনন ক্ষমতার ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য সময়। এই সময় থেকে জননক্ষমতা প্রতিবছর কমতে থাকে।

৪র্থ ১৯৮১-৯১ দশকে এটা কমে হয় ২.১%। যদিও এই হ্রাস শুভ সঙ্কেত, তবু জনসংখ্যা হ্রাসের গতি বড়ই ধীর; সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে এটা মোটেই যথেষ্ট নয়।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি দিক হল জনসংখ্যার আয়তনের বৃদ্ধি। ১৯৯১-২০০১ সময়কালে আমরা ১৮.০৬ কোটি বাড়তি মানুষ যোগ করেছি যদিও ওই সময়কালেই বৃদ্ধির হার কমে ১.৭৩% ছিল।

এই করুণ চিত্রের পিছনে একটি রুপোলি রেখাও অবশ্য আছে। নীচের নির্দেশকগুলো বিচার করলে মনে হচ্ছে পরিস্থিতির উন্নতিই হচ্ছে।

- ১৯৫১ তে হাজার পিছু শিশুর জন্ম ৩৯.৯ থেকে কমে ১৯৯৯ এসে দাঁড়ায় হাজার পিছু ২৬.১। এটা নিতান্তই জন্মহারের হিসাবে। একই সময়কালে মৃত্যুহার ২৭.৪ থেকে কমে হয় ৮.৭ প্রতি হাজারে। (SRS 1999)
- হাজারে ০-১২ মাস বয়সের শিশুমৃত্যুর হার ১৯৭১ সালে ছিল ১২৯। ১৯৯৯ সালে হল ৭০।
- ১৯৪১-৫০ সময়কালে আয়ুষ্কাল ছিল ৩২.৪ (পুরুষ), ৩১.৭ (মহিলা)। ১৯৯৯ সালে এটা হল ৬২.৩ (পুরুষ), ৬২.৯ (মহিলা)।
- NFHS–2 অনুযায়ী কোনো না কোনো রকম গর্ভনিরোধক ব্যবহার ১৯৭১ সালে ছিল ১০.৪%। ১৯৯৮-৯৯ সালে বেড়ে গিয়ে হল ৪৮%।
- মোট জনন ক্ষমতার হিসাবে ১৯৭২ সালে মহিলা পিছু শিশু জন্ম হার ছিল ৫.২। ১৯৯৮-৯৯ সালে হল ২.৮৫।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১ সালে ছিল ২.১%, ১৯৯৯ সালে হল ১.৭৩%।
- গড়পড়তা বিবাহের বয়স ১৯৬১ সালে ছিল ২১.৩ বছর (পুরুষ) ও ১৬.১ (মহিলা)। ১৯৯২ সালে এই বয়স হল ২৪.৩ (পুরুষ) ও ২০.২ (মহিলা)।

এসব নির্দেশকগুচ্ছের সঙ্গো ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য দরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি করে মানব সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার। আরও দরকার সম্পদ ব্যবহারের পুনর্বণ্টন এমনভাবে করা যাতে খাদ্য, আশ্রয়, সাক্ষরতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পানীয় জল প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনগুলো আগে মেটানো যায়। মৌলিক প্রয়োজনগুলো ছাড়াও দরকার সমাজকল্যাণের উন্নতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও বেশি বিনিয়োগ। দেখা গেছে যে স্বাস্থ্যবান, পুষ্টিসমৃদ্ধ, সুশিক্ষিত জনসংখ্যা ধারণশীল উন্নয়নের বিরাট সহায়।

মূল কথা

- ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য চাই স্থিতিশীল জনসংখ্যা।
- উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম, উন্নয়নশীল দেশে বেশি।
- ভারতে এখন জন্মহার কমছে, মৃত্যু হারও কমছে, কিন্তু মোট জনসংখ্যা এখনও বিপুল।
- জনসংখ্যাকে ধারণযোগ্য, উৎপাদন-অনুগ করার জন্য চাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া।
- উন্নততর খাদ্য, আবাস, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক পরিষেবা, সাংস্কৃতিক-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ দ্বারাই গড়ে ওঠে পরিপুষ্ট দেহ, সুশিক্ষিত মন।
- উন্নয়নে অংশগ্রহণের যোগ্য যথেষ্ট মানবসম্পদ ধারণযোগ্য উন্নয়নকে সম্ভব করে তুলতে পারে।

আর্থিক দিক ঃ সামাজিক অসাম্য ও গভীর দারিদ্র্য

ধারণযোগ্য উন্নয়নের আর একটি মাত্রা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক। আর্থিক বৃদ্ধি সারা বিশ্বেই হচ্ছে কিন্তু তারই সঙ্গো বাড়ছে দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য এবং অসমতা। বিশ্বের ৬২% গরীব লোকের বাস দক্ষিণ এশিয়ায়। সামাজিক অসাম্য এবং বেকারিত্ব জনিত সমস্যা ও দারিদ্র্য বাড়ছে উন্নত দেশেও। ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ২০% এবং বিশ্বের মোট সম্পদের মোটামুটি ৮০% থাকা সত্বেও ৫ কোটি মানুষ এখানে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। ১৯৯০ সালে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ মাত্র ২ (মার্কিন) ডলার বা তার কমে দিন কাটিয়েছে। ২০০০ সালে এই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৩০০ কোটি যা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (Population Report 2001)।

দারিদ্র্যের সঙ্গো আছে বেকারি, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, সমাজে নারীর নীচু স্থান। আছে বিপজ্জনক পরিবেশে বাস, সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবার (প্রজনন পরিষেবাসহ) সীমিত সুযোগ। এ সমস্ত কারণের ফলস্বরূপ দেখা যায় উচ্চ জননক্ষমতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বেশী সংখ্যায় মৃত্যু এবং নিম্ন অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা। জনসংখ্যার যথাযথ বিন্যাসের অভাব, স্থায়িত্বহীন উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের (যেমন জমি ও জল) অসম বন্টন, পরিবেশের ক্ষয় ইত্যাদিও দারিদ্র্যের সঙ্গো সম্পর্কিত।

ভারত সরকারের হিসাবে ভারতে ২৬% মানুষ দারিদ্র্যরেখার নীচে। বেসরকারি গবেষকদের হিসাবে এই সংখ্যা ৪১%। দরিদ্রদের বিপদ পদে পদে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক পরিষেবা নিতে পারে না বিরাট অংশের মানুষ। সকলের জন্য বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা সরকারের লক্ষ্য, তবু দেশের অনেক অংশেই এই মৌলিক পরিষেবাগুলি পৌঁছয় নি। প্রাথমিক শিক্ষায় পয়সা লাগে না তবু দরিদ্র পরিবারগুলি এ সুযোগ নিতে পারে না, স্কুলের ইউনিফর্ম ও অন্যান্য জিনিসের জন্য ব্যয় এরা যোগাতে পারে না বলে। দারিদ্র্য নিম্ন জীবনমানের কারণও বটে, পরিণামও বটে। ধারণযোগ্য উন্নয়ন প্রসঙ্গো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অপরিহার্য। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন যদি না মেটে, টিকে থাকাটাই অনিশ্চিত হয়- ধারণযোগ্য ভবিষ্যতের কথা সে ভাবতেই পারে না। বরং পরিবারের আয় বাড়াবার জন্য তারা বেশি সংখ্যক সন্তান চাইবে যাতে বার্ধক্যে তারা ওদের উপর নির্ভর করতে পারে। দারিদ্র্য দূর হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে ও তাড়াতাড়ি স্থিতিশীল জনসংখ্যা পাওয়া যাবে। ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য চাই সমাজের সব মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্য, নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর অভাব দূরীকরণ। শিক্ষা ও সামাজিক পরিষেবা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সকলের সমান সুযোগ আর্থিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, জীবনমান উন্নয়নের জন্য যা বিশেষ প্রয়োজন।

এ অবস্থায় ধারণযোগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হলে বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় আর্থিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে সাম্য ও গণতন্ত্রের সঙ্গো যুক্ত করতে হবে। তার মানে যেমন ধারণযোগ্য উন্নয়ন ছাড়া সমতা আসে না, তেমনই ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যা সমানাধিকারের পূর্বশর্ত।

জনসংখ্যা — পরিবেশ — সম্পদ ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক

জনসংখ্যা, পরিবেশ এবং সম্পদ — এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ জটিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটানো নির্ভর করে একটি সুস্থ পরিবেশের উপর। জনসংখ্যাগত কারণ, দারিদ্র্য এবং কিছু

অংশের মানুষের সম্পদ উপভোগের অক্ষমতা এবং অন্যদিকে অতি-ভোগ ও অপচয়-কেন্দ্রিক উৎপাদন পরিবেশের ক্ষতি করে, সম্পদ ক্ষয় করে এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের বাধা হয়ে দাঁড়ায় (UNFPA - 1996)।

যে তিনটি প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ পায় সেগুলো হল জল, মাটি ও বাতাস। মাটি মানে অরণ্য, খনিজ, পশুপাখি, ফল, ফুল, চাষের জন্য কৃষি ও থাকার ঘর এবং অন্যান্য মানবিক কাজকর্ম। জলের প্রয়োজন পানের জন্য, গৃহকর্মের জন্য, সেচের জন্য, শিল্প ও পরিবহনের জন্য। ঋতু ও আবহাওয়ার সামঞ্জস্যের জন্য জলাভূমিগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুমন্ডল ও বাতাসের প্রয়োজন আমাদের শ্বাসকার্যের জন্য, জীবজগতের বাঁচার জন্য। বিশুদ্ধ বাতাস ও পানীয় জল সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি।

অনেকেই মনে করেন বর্তমান হারে ব্যবহৃত হতে থাকলে তেল, লোহা, অ্যালুমিনিয়মের সঞ্চয় বড় জোর এক বা দুই শতাব্দী চলবে।

যখন আমরা ধারণযোগ্য ভবিষ্যতের কথা ভাবি তখন প্রাপ্তব্য এবং নবীকরণযোগ্য নয় এমন সম্পদের আগামী একশ-দুশ বছরে কতটা পাওয়া যাবে সেটা বিশেষভাবে বিবেচ্য। মানবজাতির সার্বিক বিবর্তনের জন্য লেগেছে কয়েক লক্ষ বছর। সম্পদের ব্যয় যে হারে বাড়ছে এবং বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা যখন রয়েছে তখন সম্পদের একশ বছরের মত যোগান মোটেই যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে নবীকরণ-অযোগ্য সম্পদের অভাব মেটাবার জন্য বিকল্প সম্পদের ভাবনা এসে পড়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে সম্পদের যে হ্রাস হয় তার ফলে দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী উন্নয়নের বেশ ক্ষতি হতে পারে। উন্নতশীল দেশগুলিতেই সম্পদের হ্রাসের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হতে থাকে। জলের পরিমাণ কমে যাবার ফলে যে সঙ্কট সেটাই উন্নয়নে মুখ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। শতাব্দীর শেষে উত্তর আফ্রিকার ৫টি দেশের সবগুলিতে; পূর্ব আফ্রিকার ৭টির মধ্যে ৬টি দেশে মারাত্মক জলসংকট দেখা দেবে। পানীয় জলের যে পরিমাণ প্রতি বছরে পাওয়া যাচ্ছে সেটাও কমতে থাকবে আগামী দশক গুলিতে।

ছক ১.৭ ঃ মাথাপিছু যে পরিমাণ জল ও মাটি পাওয়া যাচ্ছে (১৯৯০ - ২০২৫)

অঞ্চল	কৃষিজমি মাথা পিছু (হেক্টরের হিসাবে)		মাথাপিছু নবীকরণযোগ্য বিশুদ্ধ জল (কিউবিকমিটার হিসাবে)	
	১৯৯০	২০২৫	১৯৯০	২০২৫
বিশ্ব	০.২৬	০.১৬	৯,২৫৫	৫,৮৯৬
আফ্রিকা	০.২৯	০.১৩	৫,৫৩২	২,৪৬০
ইউরোপ	০.৪০	০.৩৭	৮,৬৯৯	৭,৯১৮
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ	০.৩৫	০.২২	২৯,৮১৮	৮,৩৫৯
উত্তর আমেরিকা	০.৮৪	০.৬৩	১৯,৪৬৪	৪,২১১
এশিয়া	০.১৫	০.০৯	৪,৭৬৭	৩,০৩১
ওশিয়ানিয়া	২.৪৫	১.৬৯	৩৬,২৪৪	২৫,৯৬০
ভারত	০.২০	০.১২	২,৪৫১	১,৪৯৮

(সূত্র ঃ Population Reference Bureau, Population Environment Dynamics, Data Sheet October, 1997)

মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের সঙ্গে জমির উর্বরতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। মানুষের কর্মকাণ্ড জমিসম্পদের ওপর প্রভাব ফেলে, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষয় করে এবং জমির জীবমণ্ডলকে দীর্ঘস্থায়ী সহায়তা দেবার ক্ষমতা হ্রাস করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি কৃষকদের জমিকে অতিরিক্ত ব্যবহার করে নিঃশেষ করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভূমির অবক্ষয়ের সবচেয়ে মারাত্মক রূপ হচ্ছে মরুভূমির সৃষ্টি। গৃহপালিত পশুর চারণক্ষেত্রের অতিব্যবহার মরুভূমির সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। বনাঞ্চল হ্রাস, অতিকর্ষণ এবং সেচ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে জমিতে লবণের ভাগ বেড়ে যাওয়াও মরুভূমি সৃষ্টির কারণসমূহ। পৃথিবীতে জীবনের প্রয়োজনে বনাঞ্চলের গুরুত্ব সন্দেহাতীত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বনধ্বংস গ্রীনহাউস গ্যাসের বিকিরণজাত উত্তাপবৃদ্ধির ২৫ শতাংশের জন্য দায়ী।

অতিব্যবহার ও অপচয়রোধের জন্য দরকার জৈব ও জড় সম্পদের সংরক্ষণ ও সংযত ব্যবহার। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্য এটা অপরিহার্য। পরিবেশের গুণগত পরিবর্তনের জন্য চাই ব্যাপক বনসৃজন, জলাভূমির সংরক্ষণ এবং জ্বালানিকাঠ, গোখাদ্য, গাছের বহুমুখী ব্যবহার প্রভৃতির উপর জোর। বন্য এলাকা ও বনের গাছপালা, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের সংরক্ষণ ধারণযোগ্য উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য প্রগতিশীল জনমত এবং জনগণের অংশগ্রহণ দরকার।

মূল কথা

- ধারণযোগ্য উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সম্পদের ব্যবহারে সামাজিক সমতা আসবে।
- বিশ্বের মোট সম্পদের শতকরা ৮০% আছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে। আর বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ২০% আছে সেসব দেশে। তবু ৫ কোটি মানুষ সেখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে, কারণ সম্পদ বণ্টনের অসমতা।
- ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে ২৬% জনসংখ্যা (বেসরকারি হিসাবে ৪১%)। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ নিতে পাচ্ছে না দরিদ্ররা।
- এদেশের উন্নয়নে ধারণযোগ্যতার জন্য চাই সমাজের সর্বস্তরের জন্য মৌলিক চাহিদা সুনিশ্চিত করা এবং তার জন্য চাই রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা।
- মৌলিক চাহিদার যোগান নির্ভর করে সুস্থ পরিবেশের উপর।
- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দরকার সম্পদের সঠিক ও সতর্ক ব্যবহার, সম্পদের ক্ষয় পূরণের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের উপর জোর।

ভোগ, প্রযুক্তি এবং নগরায়নের ভূমিকা

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভোগের মান ও ধরনের পার্থক্য জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের সম্পর্কের পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র ৪০ বছরে পশ্চিমের দেশগুলিতে গড়ে উঠেছে ভোগবাদী সমাজ। ভোগবাদের বিস্ফোরণ এখন উন্নয়নশীল দেশেও এসে পৌঁছেছে। বিকাশশীল মধ্যবিত্ত একই জীবনমানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জীবনশৈলী বজায় রাখার জন্য উন্নত দেশগুলির প্রয়োজন পড়ছে শক্তি এবং অন্যান্য সম্পদ, যেমন বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ইত্যাদির প্রচুর যোগান। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সামাজিক প্রাচুর্যের

ফলে শক্তির চাহিদা বেড়ে গেছে। পৃথিবীতে চরম আশংকার সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র ১/৪ বিশ্বজনসংখ্যা বিশ্বের মোট শক্তির ৩/৪ অংশ খেয়ে নিচ্ছে।

বর্তমানে উন্নত দেশগুলি বিশ্বের শক্তির চাহিদার ৭০%, ধাতুর ৭৫%, কাঠের ৮৫% ও খাদ্যের ৬০% ভোগ করছে; অথচ এরা বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র ২০%। মাথা পিছু শক্তির ব্যবহার উন্নতদেশগুলিতে মাঝের আয়ের দেশ ও দরিদ্রদেশের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি।

সারাবিশ্বে প্রতি বছর তেল ব্যবহারের পরিমাণ ৮ বিলিয়ন মেট্রিক টন। এর মধ্যে আমেরিকা খরচ করে ১.৮ বিলিয়ন, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১.৪ বিলিয়ন, পশ্চিম ইউরোপ ১.৩ বিলিয়ন, চিন ০.৭ বিলিয়ন, জাপান ০.৪ বিলিয়ন ও আফ্রিকা ০.২ বিলিয়ন।

রিও সম্মেলনে জনসংখ্যা নিয়ে যে কোন আলোচনার সময় উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অধিক জনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত সম্পদের ব্যবহার নিয়ে বাগবিতন্ডা চলে। উত্তর দেখায় উন্নয়নশীল দেশের জনবৃদ্ধির বিপুর হারের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ভয়ানক চাপ পড়ছে, দক্ষিণ প্রতিবাদ করে বলে ওঠে উন্নত দেশে প্রতিটি মানুষ উন্নয়নশীল দেশের একটি মানুষের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি সম্পদ ভোগ করে। উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও পরিবেশের ক্ষয় কিছুমাত্র কমবে না, কারণ উন্নত দেশে অতিমাত্রায় ভোগের ফলে সম্পদের ক্ষয় বেড়েই যাচ্ছে। উন্নত দেশে অতিমাত্রায় ভোগ নিয়ন্ত্রণের অনিচ্ছা আগামী দিনগুলিতে একটি বড়ো বিষয় হয়ে দেখা দেবে। পরিকল্পনাহীন শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবহনের সংখ্যাবৃদ্ধি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশিমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটাচ্ছে। বায়ুদূষণের এটা একটা মুখ্য কারণ। সারা বিশ্বে দূষণমাত্রা বাড়ছে কারণ জনসংখ্যা বাড়ছে (মানব বর্জ্যও বাড়ছে), শিল্পকারখানার অশোধিত বর্জ্য বাড়ছে, সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ অতিমাত্রায় বাড়ছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি দেখিয়ে দিচ্ছে জলদূষণের প্রভাব। এসব দেশে জলবাহিত জীবাণু সবরকমের রোগের ৮০% -এর জন্য দায়ী। ১.৩ কোটি শিশুমৃত্যুর ৯০% মৃত্যু এই কারণেই ঘটছে। পরিবারের বাঞ্ছিত আকারের উপর এর মারাত্মক প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে যা পরোক্ষভাবে দম্পতিকে আরও বেশি সংখ্যায় সন্তানের জন্য আগ্রহী করছে যাতে সন্তানদের অকাল মৃত্যুর ক্ষতি পূরণ হতে পারে।

ইদানীংকালে, বায়ুদূষণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে স্বাস্থ্য খারাপ, Green house effect -এর জন্য ক্ষতিসাধন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, অরণ্য ধ্বংস, এবং গুরুত্বপূর্ণ শস্যের ক্ষতি হচ্ছে। শহরে বায়ুদূষণ চিকিৎসা-সংকট ডেকে আনছে। প্রধানত মানুষের ক্রিয়াকলাপ, কারখানার বর্জ্য, জীবাশ্মের দহন, অরণ্যধ্বংস বায়ুমন্ডলের গ্যাসকে দূষিত করছে। আগামী কয়েক দশকে পৃথিবীর তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাবে। অস্বাভাবিক Greenhouse effect -এর জন্য তাপমাত্রা বাড়ছে। ওজোন স্তর ক্ষয়ে যাবার ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বাড়বে ত্বকের ক্যানসার ও চোখের রোগ। অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশে এই দূষণ বাড়তে থাকবে। শিল্পায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড বৃষ্টি অরণ্যের বিনাশজাত ক্ষতি বাড়িয়ে তুলবে।

নীচের ছকে দেখুন মাথা পিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন যা কয়েকটি নির্বাচিত শহরে বায়ুদূষণের প্রধান কারণ।

ছক ১.৮ ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন (নির্বাচিত দেশে) ১৯৯২

দেশ	কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমনের পরিমাণ (মেট্রিক টনের হিসাবে)
আমেরিকা	১৯.১
জার্মানি	১০.৯
জাপান	৮.৮
দঃ আফ্রিকা	৭.৫
চিন	২.৩
ইন্দোনেশিয়া	১.০
ভারত	০.৯
বাংলাদেশ	০.২

(সূত্র ঃ World Bank 1997, World Dev. Report 1997)

সারাবিশ্বেই গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়ার উর্দ্ধহার অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি বড়ো দিক। এর ফলে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৬০% মানুষ শহরাঞ্চলে থাকবে বলে অনুমান করা যায়। ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৫%। উন্নয়নশীল দেশেই এই নগরায়নের হার বেশি হবে। ১৯৭৫ সালে উন্নয়নশীল দেশে শহরে বসবাসকারী ছিল ২৬%, কিন্তু ২০১৫ সালে এই সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে ৫০%। এই পরিবর্তন শহরের পরিকাঠামো ও সামাজিক পরিষেবার ওপর ভীষণ চাপ ফেলবে কারণ ওই সময়ের মধ্যে নগরায়নের হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিষেবা বাড়ানো যাবে না।

জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, খাদ্য, আবর্জনা অপসারণ, নিরাপত্তা এবং দূষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের দেশে মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই-এর মত শহরগুলো বরাবরই গ্রামের মানুষকে টেনে আনছে। ১৯৯১ সালে বিশ্বের ৬.৯ কোটি ১৪ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে ১.৭-২.০ কোটি শিশুরা থাকত ২৩টি প্রধান শহরের বস্তিতে। ৫০-৬০ লক্ষ থাকত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। এদের অধিকাংশ নিরক্ষর। সামান্য বেতনে তাদের কাজ করতে হয় দৈনিক ৭-১২ ঘন্টা।

এই অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গেই আছে যৌন শোষণ, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। STD ও AIDS -এর আক্রমণও দিন দিন বাড়ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন উন্নয়নশীল দেশে সৃষ্টি করেছে দ্বৈত সমাজ যার ফলে বাড়ছে অসাম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং আর্থিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন। ১৯৯২ সালে বিশ্ব শীর্ষসম্মেলন এইসব শহরের স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে এগুলোর ভবিষ্যতের সাথে ধারণযোগ্য উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন দুটোকেই যুক্ত করার লক্ষ্য স্থির করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাবার জন্য সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও কর্মোদ্যম দরকার যা ক্ষমতা এবং পরিবেশ ধ্বংসের দুষ্টচক্র ভেঙে দিতে পারে। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিও প্রচন্ড জোর দিতে হবে যাতে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার প্রবণতা কমে যায়।

কাজেই কেবল জনসংখ্যাই ধারণযোগ্য উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলে না, ভোগের মাত্রা, প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতিরও প্রবল প্রভাব পড়ে। জনসংখ্যা এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের সম্পর্কটা এভাবে দেখানো হয়েছে

$$I = P \times A \times T$$

Harrison ১৯৯২ সালে এই মডেল দেখিয়েছিলেন। আগেই ১৯৭৪ সালে Paul Ehrlich এই মডেলের সাহায্যে পরিবেশ ক্ষয়ের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব দেখিয়েছিলেন।

অর্থাৎ $I = P \times A \times T$

যেখানে, I = পরিবেশগত প্রভাব (Environmental Impact)

P = জনসংখ্যা (Population)

A = প্রাচুর্য (Affluence)

T = প্রযুক্তি (Technology)

এই সমীকরণের পেছনে যুক্তি এই যে, ব্যবহার ও উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবেশ ক্ষয়ের পরিচয়। ভোক্তা ও উৎপাদকের সংখ্যা এবং মাল ও পরিষেবার জন্য তাদের চাহিদা এই ক্ষয়ের বড় উপাদান। কাজেই উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও সীমিত আর্থিক উৎপাদন পরিবেশের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ওই একই যুক্তিতে উন্নত দেশগুলিও পরিবেশের বিপুল ক্ষতি করতে পারে কারণ প্রাচুর্য (A) এবং প্রযুক্তির (T) বহুল ব্যবহার।

এই গাণিতিক রূপ এবং বিশেষ করে এই সূত্রটি সমালোচিত হলেও Ehrlich সমীকরণটি এখনও পর্যন্ত সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশে ক্ষয় বাড়ানোর ভূমিকা নির্ধারণ করার জন্য ১৯৯২ সালে Harrison আগের Ehrlich সূত্রের উপর ভিত্তি করে নতুন সূত্র দিলেন। তিনি সময়ের সাথে $I = P \times A \times T$ সূত্রের প্রত্যেক রাশির পরিবর্তন নির্ধারণ করে আরো সঠিক পরিমাপ পেলেন। বললেন জনসংখ্যাবৃদ্ধি দ্রুত প্রযুক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অতি অল্প প্রভাবই ফেলে। উন্নত দেশে ইদানীং বরং পরিবেশক্ষয়ের মাত্রা কয়েকটি অঞ্চলে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলেই তা হচ্ছে, কিন্তু জনসংখ্যা এবং ভোগ ক্রমেই বাড়তে থাকলে তা পরিবেশের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দেয় (Population Report 2001)।

নারী ও ধারণযোগ্য উন্নয়ন

নারী, জনসংখ্যা, পরিবেশ এবং উন্নয়ন — এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ জটিল, অনেক সময় স্পষ্টও নয়। এই জটিলতাকে বুঝবার একটি উপায় হল নারীকে জনসংখ্যা — পরিবেশ — উন্নয়ন, এই ত্রিভুজের কেন্দ্রবিন্দু করে দেখা। সমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান যেমন ত্রিভূজের প্রত্যেকটি শীর্ষবিন্দুকে প্রভাবিত করে, তেমনই আবার এই তিনটি উপাদান দ্বারা প্রভাবিতও হয়। প্রতিদিনের কাজের দ্বারা নারী পরিবেশকে সরাসরি প্রভাবিত করে। জ্বালানি সংগ্রহ, খাদ্য ও গোখাদ্য সংগ্রহ, পোষা প্রাণীর চারণ, ফসলের পরিচর্যা এবং জল আনা — এগুলো তাকে রোজ করতে হচ্ছে। পরিবারের জীবনধারণের জন্য এই সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা করার ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজননের দ্বারা নারী জনসংখ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। অবশ্য পুরুষও তা করে। নারীর জনন ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর, শিক্ষার স্তরের ওপর এবং স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। এটাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় পরিবার পরিকল্পনা,

মাতৃত্ব, শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার লভ্যতা ইত্যাদির দ্বারা। গৃহকর্মে, অর্থনীতিতে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

যে সমাজে মহিলারা সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, চাকুরির সুযোগ যাদের বেশি, তাদের জনন ক্ষমতা কম। পরিবেশ এবং উন্নয়নের উপর জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব এর ফলে অনেক কমে যায়। যে সমাজে পুরুষ-মহিলার সমান সুযোগ আছে সেখানে মহিলারা বেশি সুযোগ পায়, বেছে নেবার সুযোগও বেশি থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বেশি অবদান তারা রাখতে পারে। জনসংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যত সম্মেলন হয়েছে সর্বত্র স্বীকার করা হয়েছে যে ধারণযোগ্য উন্নয়নের অর্থ সবার জন্য উন্নততর জীবনমান এবং এই কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়ন মুখ্য।

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। পরিবারের সুখশান্তির পক্ষে তারাই অপরিহার্য। সামাজিক কাজে, পরিবেশ রক্ষায়ও তারাই মুখ্য। দুর্ভাগ্যবশত নীতিনির্ধারকগণ মহিলাদের এই কেন্দ্রীয় শক্তি মোটে স্বীকার করেন না। মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা অবহেলিত, সমাজে এবং পরিবারে তাদের অবদান যেন স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়।

International Conference on Population and Development (ICPD) ১৯৯৪ বলেছে নারীর ক্ষমতায়ন নারীর এবং সকলের জীবনমান উন্নয়নের চাবিকাঠি। নারীর পূর্ণ এবং সমান অংশগ্রহণ ছাড়া কখনই ধারণযোগ্য মানব উন্নয়ন সম্ভব হবে না। সক্রিয় কাজের কর্মসূচিতে লিঙ্গাসাম্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করার জন্য সর্বজনীন অধিকার, সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকল্পনার উদ্যোগ দরকার। দরকার নারীশিক্ষা এবং সম্পদ ভোগের অধিকার।

ধারণযোগ্য উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা ঃ মানবিকতা ও গুণমান সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টি কোণ

বাস্তবে ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা অবশ্যই বিবেচ্য, তবে শুধু সংখ্যা নয়, মানুষের গুণগত দিকগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্রতর এবং বৃহত্তর উভয় স্তরে উন্নয়ন ধারণযোগ্য উন্নয়নের সহায়ক হওয়া চাই। যেটা সমান উল্লেখযোগ্য, এটি সফল হবার জন্য চাই ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখন পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি ও সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইভাবে পরিবার হল একজন মানুষের প্রথম বিদ্যালয়। মনোযোগ, সংযম, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে দেয় পরিবার। পরিবারই গড়ে দেয় সংরক্ষণের মূল্যবোধ, সংযম, সম্পদের সুব্যবহারে ব্যক্তির ভূমিকা। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও তথ্যের অধিকার ধারণযোগ্য উন্নয়নের চাবিকাঠি।

দ্বিতীয় অধ্যায় | **লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন**

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে ভিন্নতা যত না শারীরিক কারণে স্বাভাবিক, তার চেয়ে বেশি সংস্কৃতিগত দিক থেকে আরোপিত। Sex শব্দটি পুরুষ এবং মহিলার জৈব ভিন্নতার দ্যোতক ও উভয়ের মধ্যেকার শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোজোম, হরমোন এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের কথা বলে। কিন্তু এটা বোঝা গেছে, বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে যে শুধুমাত্র জৈব / যৌন পার্থক্য সামাজিক সংজ্ঞার সর্বজনীন ভিত্তি হতে পারে না। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আর তাদের নিজস্ব প্রকারভেদ প্রকৃতিদত্ত, স্থায়ী কিংবা পূর্বনির্ধারিত নয়। এগুলো যুগে যুগে সমাজের দ্বারা আরোপিত। এই কারণে 'লিঙ্গ' (gender) শব্দটাকে বেশি মানানসই মনে করা হচ্ছে।

'লিঙ্গ' বলতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করা হয় যেগুলি সামাজিক শক্তি দ্বারা নির্ধারিত। এগুলি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে উঠে জন্মগত ভিন্নতাকে সামাজিক মাত্রা দেয়। যেমন ধরুন — যখন আমরা যৌন পরিচয়গত দিক থেকে আয়ুষ্কালের কথা আলোচনা করি তখন আমরা জৈব ভিন্নতার উল্লেখ করি এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেঁচে থাকার হারের তুলনামূলক আলোচনা করি। কিন্তু আমরা যখন লিঙ্গের দিক থেকে আয়ুষ্কালের ভিন্নতার কথা আলোচনা করি তখন আমরা বেঁচে থাকার উপর সামাজিক প্রভাবের দিকটার উল্লেখ করি; যথা পুত্রসন্তানের প্রতি আকাঙ্খার প্রায় সর্বজনীন অগ্রাধিকার এবং বালিকা ও মহিলাদের ক্ষেত্রে খাবার যোগান, পুষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষা আর শিক্ষা, সবক্ষেত্রেই নেতিবাচক বৈষম্য।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ভিন্নতা আংশিকভাবে জীববিজ্ঞানগত, খানিকটা হল চিরাচরিতভাবে সমাজে তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেন, আর বাকি অংশটা হল তাঁরা যেসব বিশ্বাস আর মতামত পোষণ করেন তার ভিত্তিতে গঠিত। জীবগত বৈশিষ্ট্য বোঝাতে একটা শব্দ 'যৌন' এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর জন্য আরেকটা শব্দ 'লিঙ্গ' ব্যবহার করা বেশি কার্যকর হবে। তবে সত্যিকারের জীবনে দুটোকে আলাদা করে দেখা বড়ই কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই যৌনলক্ষণের ধারণা, লিঙ্গবিষয়ক ধারণার মতই সামাজিকভাবে গঠিত হয়ে থাকে। শরীরগত এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলির সামাজিকভাবে গঠিত ধারণাগুলির বাইরে কোনো মানেই নেই। মানবজনন যতখানি জৈব প্রক্রিয়া ঠিক ততটাই একটি সামাজিক ক্রিয়া।

যাইহোক, যৌন ভিন্নতা এবং লিঙ্গবৈসাদৃশ্য যেখানে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট তেমন একটি ক্ষেত্র হল পুরুষ এবং নারীর মধ্যে প্রচলিত বৈষম্য, পুরুষের কাছে নারীর নতিস্বীকার। কিভাবে সমাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা নিয়ে লিঙ্গবৈষম্য করা হয় তার এটিই হল যথাযথ ধারণা এবং এই গতানুগতিক ভূমিকাটিই মানবজীবনের সমস্ত দিককে প্রভাবিত করে থাকে।

প্রায় সব সমাজেই পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনেক কম মূল্যবান বলে মনে করা হয়। গৃহকোণে, কাজের জায়গায় এবং সমাজে তাঁদের অবদান উপেক্ষিত হয় নতুবা খাটো করে দেখা হয়ে থাকে। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে, নিজের পরিবারের আয়তন এবং সন্তানধারণের ব্যবধান সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে বাইরের কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাঁদের মতামতের মূল্য নগণ্য কিংবা কোনো মূল্যই নেই। পুরুষদের চেয়ে নারীদের শিক্ষা পাবার সুযোগ কম, বৃত্তিনির্বাচনের বিকল্প স্বল্পতর এবং উপার্জনও অপেক্ষাকৃত

কম। তাঁদের দুর্বল অবস্থান সরাসরিভাবে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত যে মহিলারা আদতে হল সন্তানের জন্মদাত্রী এবং ধাত্রী।

নিজের পরিবারের মধ্যেই মহিলা এবং কন্যাশিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সূত্রপাত ঘটে যায় যেখানে তারা প্রথম থেকেই শেখে যে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের স্থান গৌণ। এই অপসংস্কারটি হামেশাই চিরাচরিত প্রথা, ধর্মীয় উপদেশ এবং সনাতন ঐতিহ্যের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ঝোঁক বুঝবার অন্যতম নির্দেশক হল যৌন অনুপাত। যদিও ভারতীয় সংবিধান নারীপুরুষের মধ্যে বৈষম্য করে না, তবু শিশু কন্যাটির গর্ভে আগমন থেকে বৃদ্ধা হওয়া অবধি প্রতিকূল বৈষম্য বজায় থাকে। প্রতি স্তরে বৈষম্যের শিকার হবার দরুণ পুরুষ ও নারীর লিঙ্গ অনুপাতটাই ক্রমশ কমে আসছে।

ছক ২.১ ঃ ভারতে লিঙ্গ অনুপাত

সাল	লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ জন পুরুষ প্রতি নারীর সংখ্যা)
১৯৫১	৯৪৬
১৯৬১	৯৪১
১৯৭১	৯৩০
১৯৮১	৯৩৪
১৯৯১	৯২৭
২০০১	৯৩৩

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে পুরুষের তৈরি সামাজিক ব্যবস্থা মেয়েদের মনের মধ্যে এই ধারণাটি ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে যে তারা পুরুষদের চেয়ে হীন আর পুরুষরাই তাদের রক্ষক এবং তাঁদের চেয়ে পুরুষদের স্থান উচ্চে। শ্রেণি, জাতপাত, এলাকা এবং আরো নানা উপাদানের ওপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষের এই বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রযুক্তিও নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ঝোঁক প্রদর্শনে খুব একটা পিছিয়ে নেই। যেসব পিতামাতা পুত্রসন্তান পছন্দ করেন তাঁরা জন্মের আগেই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করেন এবং কন্যা হলে তাকে গর্ভপাত বা জন্মের পরে অবহেলার পথে ঠেলে দেন। ভ্রূণের লিঙ্গানির্ধারণ পদ্ধতির সহায়তায় ১৯৭২-৮২ সালের মধ্যে আটাত্তর হাজার (৭৮,০০০) কন্যাভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে একটি সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে। মহারাষ্ট্র সরকার দ্বারা পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষার রিপোর্ট মত শুধু মুম্বইতেই একবছরের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) অনুরূপ পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ভ্রূণের লিঙ্গানির্ধারণের এই প্রযুক্তির অপব্যবহার উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট এবং হরিয়াণার ছোট ছোট শহরেও ঘটছে। ভ্রূণের লিঙ্গানির্ধারণের পরীক্ষার সুবিধা এখন গ্রামীণ এলাকাতেও প্রসারিত হয়েছে। ফলে ০-৬ অবধি বয়সের কন্যা শিশুর লিঙ্গ অনুপাতে ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটে চলেছে। ১৯৬১তে এটা ছিল হাজার পুরুষ প্রতি নয়শ ছিয়াত্তর (৯৭৬)। ১৯৭১-এ এটা কমে হল নয়শ চৌষট্টি (৯৬৪)। ১৯৮১-এ নয়শ বাষট্টি (৯৬২) আর ১৯৯১-এ নয়শ পঁয়তাল্লিশে (৯৪৫) নেমে এল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবনতি হল ১৯৯১-২০০১ যখন সংখ্যাটা নয়শ সাতাশে (৯২৭) এসে ঠেকল। ২০০১-এর জনগণনায় যেটা সবচেয়ে শঙ্কাজনক তা হল শিশু লিঙ্গা

অনুপাতের চরম অবনতি ঘটেছে অর্থনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো প্রদেশগুলিতে, যথা পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট এবং দিল্লী আর চণ্ডীগড়ে।

বৈষম্য প্রদর্শনের এলাকাগুলি

যদি নারীর প্রতি পারিবারিক এবং সামাজিক স্তরে কোনো বৈষম্য প্রদর্শিত না হয় তাহলে যে কোনো প্রদত্ত স্তরে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে। নারীজাতির প্রতি এ এক জৈব উপহার। কিন্তু লিঙ্গাঘটিত সূচকের মান ০.৫৭৪ এবং পদবিন্যাসে একশ তিন তম স্থান (১০৩তম) ভারতে লিঙ্গাবৈষম্যের দিকে নির্দেশ করে (UNDP, 2003)।

১। শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্য

প্রায় সব সমাজেই মহিলারা পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক পরিচর্যা করে থাকেন। তাঁদের শিক্ষিত করে তুললে পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

পৃথিবীতে এখন ৯৬ কোটি নিরক্ষর, তার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি হল নারী। কমপক্ষে ৬ কোটি বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার নাগাল পায় না।

ভারতবর্ষে মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৪.২ শতাংশ। প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তরেও বিদ্যালয় ছুট মেয়েদের হার ছেলেদের হারের চেয়ে বেশি। যতই শিক্ষা উচ্চস্তরের দিকে যায় এই পার্থক্যটাও বেড়ে চলে। ভারতবর্ষে মাত্র আট শতাংশ মেয়ে প্রারম্ভিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে; দুই শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক এবং প্রায় দুই শতাংশ স্নাতক স্তর অবধি পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শিক্ষায় সবচাইতে বেশি অবহেলিত হয় গ্রামীণ স্ত্রীলোকেরা। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তিতে এই বৈষম্য শুধু যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই হয় তা নয়, উন্নত দেশগুলিতেও দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য পুরুষের চেয়ে কম সংখ্যক মহিলা পৌঁছতে পারছে।

ছক ২.২ ঃ উচ্চতর শিক্ষায় নাম লেখানো পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত (১৯৯৪)

দেশ	পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনুপাত (শতাংশ হারে)
অস্ট্রিয়া	৮০
বেলজিয়াম	৭০
জাপান	৬৩
সুইজারল্যাণ্ড	৫৩
লুক্সেমবুর্গ	৫২

গবেষণা করে দেখা গেছে দশ বা তার বেশি বছর ধরে স্কুলশিক্ষা প্রাপ্ত মেয়েদের তুলনায় আদপেই স্কুলে না যাওয়া মহিলার সন্তানসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ (Ashford,2001)।

নিচে দেওয়া কারণগুলো অবধারিতভাবে মহিলাদের বিদ্যায়তনে কম সংখ্যায় নাম লেখানো এবং সেখানে টিকে থাকার সময়ের স্বল্পতা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

- একটু বড় বয়সের কন্যাসন্তানটির তার মায়ের অন্য বাচ্চাগুলিকে দেখাশোনা করবার জন্য বাড়িতে থাকার প্রয়োজন হয়।
- কন্যাসন্তান পরিবারের আয় বাড়াবার জন্যে কাঁচাবয়স থেকেই কাজে লেগে যায়।
- অপরিণত বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।
- সামাজিক প্রথা এবং আচারসমূহ।
- কন্যাসন্তানের শিক্ষালাভের পক্ষে অনুপযোগী পরিবেশ, যথা স্কুলের নিজস্ব বাড়ি, ছাত্রীনিবাস, শিক্ষিকা প্রভৃতির অভাব।

২। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মহিলাদের কম পরিমাণে অংশগ্রহণ

এটা দেখা গেছে যে মহিলারা যতক্ষণ জেগে থাকেন তার অধিকাংশ সময় ধরেই কাজ করে চলেন, কিন্তু তা সাধারণভাবে 'কাজ' বলে গণ্য করা বা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় না। তাই মহিলাদের 'শ্রমিক' বলে গণনার মধ্যেই আনা হয় না। যদি হিসেবের মধ্যে শুধু মহিলা কর্মীরা যা করেন সেটা না ধরে সাধারণভাবে মহিলারা কী কী করেন সেগুলো ধরা হয় তাহলে মহিলাদের ভূমিকা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে ভালো করে বোঝা যাবে। সবচাইতে বেশি সংখ্যক মহিলা নিযুক্ত থাকেন স্বল্প দক্ষতার এবং কম মাইনে পাওয়া কাজে।

উন্নয়নশীল জগতে যত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় মহিলারা তার আশি শতাংশ উৎপাদন করেন, কিন্তু যে জমি তাঁরা চাষ করেন কদাচিৎ সেটাতে তাঁদের স্বত্ব থাকে। সারা পৃথিবীতে শ্রমের বিনিময়ে মাইনে পাওয়া কর্মী বাহিনীর এক তৃতীয়াংশই হলেন মহিলা। অন্য অনেক কাজের জন্য তাঁদের অবশ্য কোনো মাইনে দেওয়া হয় না। বৃহত্তর বৃত্তের আরো অনেক কাজের সঙ্গে জল তোলা, জ্বালানি কুড়োনো ইত্যাদিও এর মধ্যে পড়ে। মহিলারা অর্থনীতির প্রথাবহির্ভূত দিকটিতে সর্বেসর্বা এবং এই কাজগুলো অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান নির্ধারণ করবার সময়ে প্রতিফলিত হয় না। যদি সামগ্রিক হিসেবনিকেশের সময়ে মোট গৃহজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'ঘরের কাজ' কে ধরা হয় তাহলে পরিমাণটা পঁচিশ শতাংশ বেড়ে যাবে।

যখন মহিলাদের সব ধরনের কাজ হিসেবের মধ্যে আসবে, অর্থনীতিতে তাঁদের অবদান আশাতীতভাবে বেড়ে যাবে এবং পুরুষদের করা ঐ ধরনের কাজের চেয়ে স্বভাবতই বেশি হবে। এটাও স্পষ্ট যে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করেন। উন্নয়নশীল দেশে মহিলাদের কাজ করার সময় পুরুষদের সময়ের চেয়ে তিরিশ শতাংশ বেশি হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে মাত্র বাইশ শতাংশ মহিলা দৃষ্টিগ্রাহ্য কাজ করতেন, আর তাবৎ কর্মী মহিলার মধ্যে উনিশ শতাংশ কৃষি বহির্ভূত কাজে নিরত থাকতেন।

কর্মী বাহিনীতে মহিলাদের সত্যিকারের অবদান পরিসংখ্যান আর সমীক্ষায় প্রতিফলিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ সারা বিশ্বে মহিলারা —

- বিশ্বে মোট যত ঘণ্টা কাজ করা হয় তার দুই-তৃতীয়াংশ করেন, কিন্তু বিশ্বের মোট আয়ের এক-দশমাংশ মাত্র উপার্জন করেন।
- যত গৃহকাজ আছে তার প্রায় সবটাই করেন।
- যত রকমের সংগঠিত স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে তার যোগফলের চেয়ে বেশি পরিমাণে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা যুগিয়ে থাকেন।

- বিশ্বে উৎপন্ন খাদ্যের অর্ধেক অংশ উৎপাদন করেন, কিন্তু তাঁরা পৃথিবীর মোট জমির মাত্র এক শতাংশের মালিক।
- পৃথিবীতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে শ্রম কেনা হয় তার এক-তৃতীয়াংশ যোগান মহিলারা, কিন্তু সবচেয়ে কম পয়সা উপার্জনের যে ক্ষেত্রগুলি আছে সেখানেই মহিলাদের ভিড় দেখা যায়।

গৃহস্থালির কাজকর্ম, শিশুর যত্ন, সেইসঙ্গে কৃষিকাজে সহায়তা আর তাঁদের শ্রমের যা আর্থিক মূল্য হবার কথা শুধু যে সেটাই গুরুতরভাবে কমতি হারে দেখানো হয় তাই নয়, শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রেও কম প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা দেখা গেছে যে গৃহস্থালির কাজের চাপে শিশুকন্যাদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে আনা হয় যা বাচ্চাগুলির শিক্ষার সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং বড় পরিবার আর চিরন্তন দারিদ্র্যের জমি তৈরী হয়।

৩। স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক ব্যবহার

নারী-পুরুষের বৈষম্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হল নারীর স্বাস্থ্য যার সঙ্গে প্রজননগত স্বাস্থ্য এবং সারাজীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে চলাও জড়িত। কয়েক ধরণের সমাজে বয়স্ক পুরুষ আর বালকদের খেতে দেবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে — তাঁদের খাওয়া হয়ে গেলে উদ্বৃত্ত যেটুকু থাকে মহিলা এবং বালিকারা তাই খায়। ফলে বালিকা, বৃদ্ধা এবং অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাদের পুষ্টিগত দিক থেকে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়। কন্যাসন্তানদের অতিরিক্ত মৃত্যুহারের কথা মাথায় রাখলে তার পেছনের কারণগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে, যথা কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়া, বালকদের চেয়ে স্বাস্থ্যের কম যত্ন পাওয়া এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ কম গ্রহণ করা। বালিকারা তাদের ভাইদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কাজ করতে নামে এবং বেশি সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করে। এও দেখা গেছে যে উন্নয়নশীল জগতে সন্তানধারণক্ষম মহিলারা সারাদিনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ২,২৫০ ক্যালরি পান না।

একজন ভারতীয় মহিলা সারাদিনে কোনমতে ১৪০০ ক্যালরি যুক্ত খাবার খেয়ে থাকেন। এই ঘাটতি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়ে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে পুষ্টির ঘাটতির জন্যে দায়ী হল দারিদ্র্য আর পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতির অভাব। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের ধ্যানধারণা ও লিঙ্গবৈষম্যের জন্য মহিলাদেরই এটা বেশি সহ্য করতে হয়। বালক এবং পুরুষদের পরিমাণমত এবং গুণগতভাবে ভালো খাবার খাইয়ে দেবার প্রবণতা মহিলাদের একটি বিরাট অংশের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত ধারণার ফল। যেখানে সামগ্রিকভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান আছে এবং যেখানে সদস্যদের চাহিদার তুলনায় খাবার যথেষ্ট নয় — দু'ধরনের পরিবারেই এই ধারণাটি সমানভাবে জোরালো। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারগুলিতে, যেখানে বালিকা এবং মহিলারা পুরুষদের সমান বা বেশি আয় করে (টাকায় বা জিনিষে) সেখানেও তারা পুরুষদের সমান সমানের বদলে কম খাবার খায়; এমনকি গর্ভধারণ এবং স্তন্যপ্রদানের সময়েও এটাই হয়ে থাকে। যে বালিকাটি অল্পবয়সেই পুষ্টি গ্রহণের বেলায় বৈষম্যের শিকার, তাকে মায়ের সাহায্যকারী হিসেবে গৃহস্থালির নানা কাজ আর দায়িত্বপালন করতে হয়, যেমন বাচ্চাদের তদারকি ইত্যাদি। ফলে অল্পবয়সেই বালিকাটির জীবন সম্বন্ধে যা কিছু স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় চাহিদা, উচ্ছ্বাস আর আনন্দ, সবই ক্ষুণ্ণ হয়। পর্যাপ্ত পুষ্টি আর স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সুরক্ষা ব্যতিরেকেই বালিকাটি বড় হয়ে ওঠে এবং সে জানেও না যে তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। অতিরিক্ত কাজে ভারাক্রান্ত এবং কম খাবার খাওয়া এইসব মহিলা, যাঁরা বিশ্রামও খুব অল্পই পান,

তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থার পেছনে নানা কারণ আছে। দি ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্ল্যান (NPP) ১৯৮৮-২০০০ (গভঃ অব্ ইন্ডিয়া, ১৯৮৮) সেগুলিকে এইভাবে তালিকাবদ্ধ করেছে

(i) গ্রামে এবং শহরে, দূরবর্তী, পশ্চাৎপদ, পাহাড়ি এবং মরু অঞ্চলে আর্থসামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত গোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশ্নে অধিকতর বৈষম্য ঘটে থাকে।

(ii) আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংস্কারগুলি বালিকা ও মহিলাদের উন্নতির পরিপন্থী।

(iii) অতিমাত্রায় সংক্রমণ, অপুষ্টি এবং বহুবৎসরব্যাপী অনিয়ন্ত্রিত গর্ভসঞ্চারের সামগ্রিক প্রভাবের ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়।

(iv) মহিলা ও শিশুদের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বল্পতা (যার মধ্যে পড়ে মা ও শিশুর যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা, ডাক্তারি হস্তক্ষেপে গর্ভপাত, পুষ্টি), পরিষেবার পরিধি, গুণগত মান, লভ্যতা ইত্যাদি।

(v) মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রাপ্ত উপকরণগুলির অদক্ষ ব্যবহার যার ফলে তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি যথেষ্ট গতি পায় না।

(vi) সাধারণ অজ্ঞতা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিজের যত্ন নেওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। ফলে লভ্য উপকরণগুলিকেও পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় না।

(vii) স্বাস্থ্য ছাড়াও অন্য আবশ্যক সুবিধা যেগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার পরিপূরক, যেমন পানীয় জল, শৌচাগারাদি, নারীশিক্ষা, খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদির না থাকা বা যথেষ্ট না থাকা।

জাতীয় জনশিক্ষা প্রকল্প আরও লক্ষ্য করেছে যে অপুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশের শ্লথগতি, রোগ, পঙ্গুতা এমনকি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যেমন অতি শৈশবে, বাল্যে এবং কৈশোরে ও প্রজননক্ষম অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি মহিলারাই বেশি বহন করেন। বৃদ্ধাবস্থায় তারা স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার এবং রজোনিবৃত্তি সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন।

৪। মা ও শিশুর যত্নে অবহেলা

মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কমিটি অন স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া (CSWI) খেয়াল করেছিল যে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এতটাই বেশি যে সেটা মহিলাদের মোট মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয় এবং এটাই প্রতিকূল লিঙ্গ অনুপাতের অন্যতম কারণ। বেশ কয়েকটি সমীক্ষা দেখিয়ে দিয়েছে যে অধিকাংশ গর্ভপাত এবং প্রাক-প্রসব শিশুমৃত্যুর কারণ হল অকালে জন্মগ্রহণ এবং অপুষ্টি। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর একটা বড় অংশ আসে ঘন ঘন গর্ভধারণের কারণে এবং প্রোটিনের ঘাটতি ও অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা থেকে। এই চিত্র দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। NPP দলিল অনুসারে এই উপমহাদেশে সারা জীবনে গর্ভধারণ সংক্রান্ত কারণে প্রতি আঠারোজনে একজন মহিলা জীবনসংশয়ের ঝুঁকির মুখোমুখি হন। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর মুখ্য কারণসমূহ হল রক্তাল্পতা, রক্তক্ষরণ, রক্তে বিষক্রিয়া, পচন রোগ এবং গর্ভপাত।

স্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গো দারিদ্র্য বিশেষভাবে যুক্ত এবং দরিদ্রদের বিরাট অংশই মহিলা। দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের থাকে সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষমতা, সবচেয়ে কম পুষ্টি, সুদক্ষ যত্নের সীমাবদ্ধ সুযোগ যার সবগুলিই মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

শিশুর যত্ন মহিলাদের একটি বড় দায়িত্ব এবং উদ্বেগের বিষয়। আমাদের দেশে এটা মূলত ব্যক্তিগত স্তরের ব্যাপার এবং আমাদের সমাজের শ্রেণি-বৈষম্য জীবনের আর পাঁচটা দিকের মত এই ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলারাও 'ক্রেশ' এবং ওই ধরনের সুযোগ সুবিধে সন্তোষজনক না থাকায় অসুবিধা বোধ করে থাকেন। অন্য কোনো সহায়ক ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি, তাই মহিলারা যৌথ পরিবারের অবলুপ্তির কুফল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু কর্মরত মহিলা, নিম্নমধ্যবিত্ত স্তর থেকে কমবয়সী মেয়েদের কাজে বহাল করে পরিস্থিতিটাকে বাগে আনতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এটাকে আদর্শ ব্যবস্থা বলা যাবে না এই জন্য যে ওই অল্পবয়সী মেয়েরা এই ধরনের কাজের জন্য প্রশিক্ষিত নয়। আজকের শিশু এমন একটা জগতে বেড়ে ওঠে যেটা একই সঙ্গো জটিল ও বিপদসংকুল। এছাড়াও একটা শিশুর চাহিদা শুধুমাত্র খাবার, খেলনা আর জামাকাপড়ের চেয়ে অনেক বেশি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা এখনও দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশে শিশুপালনের অর্থ এবং বিষয়বস্তু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারিনি।

যেসব মহিলারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন যেমন গৃহস্থালিক্ষেত্রে উৎপাদক হিসেবে অথবা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক হিসেবে, তাঁদের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। সেইসব মহিলারা বয়স্ক আত্মীয়দের — যথা স্ত্রী বা স্বামীর মাতাপিতা, খুড়ো, খুড়িমা, অবিবাহিতা বোনেরা, একটু বড় হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়ে, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশি — এইসবের এক বিস্তৃত সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁদের শিশুসন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

৫। <u>অল্প বয়সে বিবাহ</u>

<u>চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেন্ট এ্যাক্ট</u> (১৯৭৬) অনুযায়ী ভারতবর্ষে মেয়েদের ক্ষেত্রে আইন সম্মত বিয়ের বয়স হল আঠারো বছর। আইন থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে বন্ধ হয় নি। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি। আইন লঙ্ঘনের দুই-তৃতীয়াংশই উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশে ঘটে বলে জানা গেছে। কম বয়সে বিয়ে হলে তা একটি মেয়ের স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ দুটোরই গুরুতর ক্ষতি করে, কারণ তাকে অতি অল্প বয়স থেকেই শিশুর জন্মদান এবং লালন করার বৃত্তে আটকা পড়ে যেতে হয়। তের থেকে উনিশের মধ্যেই মহিলারা মোট জন্মহারের দশ থেকে পনেরো শতাংশ শিশুর জন্মদান করেন। এই তরুণী মায়েরাই মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ শতাংশের মধ্যে পড়েন (ভারত সরকার, ১৯৯৮)।

৬। <u>মহিলাদের ওপর বেআইনী বলপ্রয়োগ</u>

মহিলাদের ওপর বেআইনী বল প্রয়োগের ঘটনা জগৎ জুড়েই ঘটে। কুড়ি থেকে ষাট শতাংশ মহিলা তাঁদের জীবনসঙ্গীর দ্বারা প্রহৃত হন। এই সমস্যা সব স্তরের মহিলাদের হলেও দরিদ্র মহিলাদেরই এটা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি করে। লিঙ্গাভিত্তিক অমর্যাদা ব্যাপকভাবে হয় এবং একজন স্ত্রীলোকের পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক, যৌন এবং মানসিক অমর্যাদা ঘটে। এর মধ্যেই আছে বালিকাদের যৌন নিগ্রহ, পণ-সংক্রান্ত বলপ্রয়োগ, বিবাহিত জীবনে ধর্ষণ, স্ত্রীযৌনাঙ্গাছেদ, যৌন হয়রানি, যৌন নিগ্রহ, নারীপাচার, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি, শিশু কন্যা হত্যা এবং বিশেষ করে কন্যাসন্তানের অপুষ্টি (UNFPA, 2000)।

- আমেরিকায় প্রজননক্ষম মহিলাদের মধ্যে স্বামীর অত্যাচার তাঁদের শারীরিক আঘাতের মুখ্য কারণ।
- রাশিয়ান ফেডারেশনে ১৯৯৩ সালে স্বামীর হাতে ১৪,৫০০ স্ত্রী খুন হয়েছেন এবং ৫৬,০০০ মহিলা আহত হয়েছেন।

সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নারীদের প্রতি পীড়নের একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

ছক : ২.৩ (সময়কাল ২০০০ সাল)

অত্যাচারের ধরন	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
পণের কারণে মৃত্যু	৬,৯৯৫	২৯৩
ধর্ষণের ঘটনা	১৬,৪৯৬	৮৩০
অপহরণ ও লাঞ্ছনা	১৪,৬৪৫	৭০১
যৌন নিগ্রহ	৩২,৯৪০	১০৫৭
বধূ নির্যাতন	৪,৫৭,৭৮১	৪০২৫

উৎসঃ 1) The Additional Director General of Police, State Crime Records Bureau, Kolkata
2) National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs; Govt. of India

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে (১৯৮৭-৯১)-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ ধর্ষণের সংখ্যা সাতহাজার সাতশ' সাতষট্টি (৭,৭৬৭) থেকে বেড়ে ন'হাজার সাতশ' তিরানব্বইতে (৯,৭৯৩) পৌঁছেছে অর্থাৎ ছাব্বিশ শতাংশ বেড়েছে। শারীরিক লাঞ্ছনা বেড়েছে সাতাশ শতাংশ আর অপহরণ বেড়েছে ছত্রিশ শতাংশ। এই একই সময়সীমার মধ্যে পণের জন্য মৃত্যুও বেড়েছে। পনেরো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যবর্তী বয়সের মেয়েদের মধ্যে বত্রিশ শতাংশ মেয়ে পুড়ে যাবার ফলে মারা যায়। মহিলাদের আত্মহত্যার ঘটনাও খুব আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে।

১৯৯১ সালে সারা দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে যত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার ৬৮.৩% ঘটেছে নিম্নলিখিত প্রদেশে ঃ মধ্যপ্রদেশ (১৭.৬%), উত্তর প্রদেশ (১৫.৭%), মহারাষ্ট্র (১৩.৯%), অন্ধ্রপ্রদেশ (৭.৯%) এবং দিল্লীতে।

মহিলারা যত ধরনের শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন তার চল্লিশ থেকে আশি শতাংশের জন্য দায়ী পরিবারের কোনো ঘনিষ্ঠ সদস্য। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইমেন দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তর্গত যৌন আচরণের ওপর একটি গুণগত সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে মহিলারা তাঁদের স্বামীদের যৌন আকাঙ্খা বা কোনো বিশেষ ধরনের যৌন আচরণের কাছে নতিস্বীকার করেন যাতে মারধোর না খেতে হয়। তাঁদের এই ভয়ও থাকে যে যদি তাঁরা নতিস্বীকার না করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ আনা হবে। মহিলাদের নিম্নমানের আর্থসামাজিক অবস্থানও তাঁদের শারীরিক এবং যৌন লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে অধিকতর অসহায় করে তোলে। এমনকি মেয়েরা নিজেরাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে খানিকটা পরিমাণে শারীরিক লাঞ্ছনাকে ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করেন যেমন সময়ে খাবার তৈরী না করা, বাচ্চাদের যত্ন না করা, তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া ইত্যাদি (IIPS, 2000)।

মহিলাদের প্রতি অমর্যাদাপূর্ণ আচরণ তাঁদের জীবনের নানা দিকে প্রভাব ফেলে যার মধ্যে পড়ে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান, শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা, দশজনের সঙ্গে কাজে অংশগ্রহণ, নিজের জীবন যাপনের স্বাধীনতা, যৌন তৃপ্তি এবং শিশুসন্তানদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা।

যৌন অত্যাচার মহিলাদের প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের ওপরেও বড় রকমের প্রভাব ফেলে। যৌন আক্রমণ থেকে যে অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার হয় তার ফলে বিপজ্জনক বা অবৈধ গর্ভপাত করা হয় যাতে গভীর অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। যৌন অত্যাচার নিজের সম্পর্কে ধারণার ক্ষতি করে, অনেক কম বয়স থেকে যৌন আচরণ শুরু হয়ে যায় এবং অরক্ষিত যৌন আচরণে STD এবং AIDS হবার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

মহিলাদের বিরুদ্ধে বেআইনী বলপ্রয়োগের কতিপয় কারণ নিচে দেওয়া হল ঃ

- শিশুকাল থেকেই মেয়েদের সামাজিকভাবে বশ্যতাপালনের ভূমিকায় রাখার সাংস্কৃতিক বাতাবরণ।
- পুরুষমানুষের 'গ্রহণযোগ্য' আচরণ সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক রীতি অর্থাৎ মেয়েদের দাবিয়ে রাখার পুরুষের 'অধিকার', মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা উৎকৃষ্ট এই ধারণা এবং 'পুরুষালী' হওয়া মানে আধিপত্য দেখানো এবং 'কড়া হওয়া'।
- মতবিরোধের নিষ্পত্তি করতে শারীরিক বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেওয়া।

৭। রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে মহিলাদের পিছিয়ে পড়া অবস্থান

যদিও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এমন সব দেশে যেখানে নির্বাচক মণ্ডলীর অর্ধেকেরও বেশি মহিলা এবং তাঁরা নেতৃত্বদানে নজর কেড়েছেন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে সক্ষম; তথাপি সরকারী আইন ও বিচার ব্যবস্থার শাখাগুলিতে পুরুষের আধিপত্যই রয়ে গেছে। এছাড়াও সারা বিশ্বে নির্বাচিত বিধায়কদের মাত্র দশ শতাংশ মহিলা। এটা ইউনাইটেড নেশনস ইকনমিক এ্যান্ড সোস্যাল কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা তিরিশ শতাংশ থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে। এমনকি গঠিত হবার পঞ্চাশ বছর পরেও রাষ্ট্রসংঘেই উচ্চপদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাঞ্ছিত হারের চেয়ে কম।

মাত্র চব্বিশটি দেশের বা সরকারের শীর্ষস্থানে মেয়েরা আছেন, যদিও ১৯৯৪ সালের শেষে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলাকে দেখা গেল। তবু সাংসদ হিসেবে মহিলাদের অনুপাত কমই রয়ে গেছে। একুশটি দেশে সাংসদদের মধ্যে কুড়ি শতাংশ মহিলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ১৯৯৪ সালে সংসদের নিম্নকক্ষে মহিলাদের গড় এগারো শতাংশের চেয়ে কম, আর উচ্চকক্ষে নয় শতাংশের কম। আটটি দেশে কোনো মহিলা সাংসদ নেই। সাম্প্রতিককালে যদিও কিছু দেশে মহিলা সাংসদদের অনুপাত লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আঞ্চলিক তথ্যাদি দেখায় যে মোটের ওপর তা নগণ্য।

ভারতবর্ষে সংসদে মহিলারা যতগুলি আসন দখল করেন তা হল মাত্র ৯.৩ শতাংশ (UNDP, 2005)। জনজীবনে মহিলাদের ভূমিকা সীমিত। মাত্র ২.৩ শতাংশ মহিলা প্রশাসক / পেশাদারী ম্যানেজার এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মহিলাদের স্থান মাত্র এক পঞ্চমাংশ। স্থানীয় সংস্থা যেমন পঞ্চায়েত আর পুরসভায় মহিলাদের জন্য তেত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলস্রোতে আনা যায় কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বামী, ভ্রাতা বা পিতার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই চলতে বাধ্য হন। বহু ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পুরুষেরা, নির্বাচিত মহিলারা নন।

জনসংখ্যার সুস্থিতিভবনের জন্য আবশ্যিক লিঙ্গাসমতা, অপক্ষপাত এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন

নারী এবং পুরুষের মধ্যে লিঙ্গাসাম্য বলতে বোঝায় সমান ক্ষমতার ভারসাম্য যেখানে স্ত্রী বা পুরুষ-কোনো একটি লিঙ্গা কর্তৃত্বের ভূমিকায় থাকবে না। লিঙ্গাসাম্য সকল স্ত্রীলোক ও পুরুষকে তাদের দায়িত্ব পালন এবং অধিকার প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করে। এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সমান নিয়ন্ত্রণ দান করে। সামাজিক মর্যাদা, পণ্য ও পরিষেবা পাবার সুযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই সমতা প্রযোজ্য।

তাছাড়া, এটা বুঝতে হবে যে পুরুষ এবং মহিলার চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন এবং লিঙ্গা সচেতনতার দক্ষতার সঙ্গো ওই সব চাহিদার প্রতি সাড়া দিলে আমরা আরো একটু সমতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এতে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই তাদের নিজ নিজ সামাজিক সুবিধেগুলি পাবে এবং সমাজে নিজের নিজের ভূমিকা ও দায়িত্ব সমূহের সুফল উপভোগ করতে পারবে। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মানে এই নয় যে স্ত্রী পুরুষ এক হয়ে গেল; এর মানে হল তাদের জীবিকার্জন এবং সুযোগপ্রাপ্তি তাদের যৌন লক্ষণ দ্বারা নির্ধারিত হবে না।

যৌন এবং প্রজনন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও লিঙ্গাসমতা কেন্দ্রস্থান অধিকার করে আছে। স্ত্রী এবং পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকা, চাহিদা এবং দৃষ্টিভঙ্গী আছে এইটা উপলব্ধি করতে হবে। এর মধ্যেই আছে ব্যক্তির সততার প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সমীহ, যৌন আচরণ সম্পর্কে সম্মতি ও তার ফলাফল এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া।

লিঙ্গা অপক্ষপাত বলতে বোঝায় কিছু পদক্ষেপ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বীকৃত ধারণা যা সমাজে লিঙ্গা নির্বিশেষে স্ত্রী এবং পুরুষের দায়িত্ব এবং বিভিন্ন সুবিধার ন্যায্য অংশ পাওয়াকে সুনিশ্চিত করে। লিঙ্গা অপক্ষপাত আইনের চোখে সমান ব্যবহারকে মেনে নেয়। আরো যা স্বীকার করে তা হল বৃত্তির সমান সুযোগ, একই মানের কাজের জন্যে একই রকম বেতন এবং জনগণের জন্য কোনো কাজে সমান অংশ গ্রহণ।

ক্ষমতায়ন সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার সাহায্যে ক্ষমতাহীন লোকেরা তাদের জীবনের পরিস্থিতির ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। এতে শুধু যে সম্পদের উৎসের ওপরেই আগের থেকে বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবে তা নয়, অধিকতর আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমান ক্ষমতা (Ashford 2001) থাকাকেও বোঝায়।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় মহিলাদের কাছে সম্পদকে প্রাপ্তিযোগ্য করে তোলা যার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, সেইসঙ্গো নিজেদের জীবন এবং প্রজনন ক্ষমতার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। যে সমস্ত পরিকাঠামো আর প্রতিষ্ঠান লিঙ্গাবৈষম্য এবং সমাজের আর্থ-সামাজিক অসাম্যকে জোরালো করে তোলে, তাদের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। জনসংখ্যার স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে মহিলাদের ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন তাদের শিক্ষার উন্নতি, উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ এবং নিজেদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে যৌন এবং প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য প্রসঙ্গো, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

যেহেতু মহিলা এবং বালিকাদের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রায়শঃ নিজেদের পরিবারের মধ্যেই ঘটে যেখানে তারা প্রথম শেখে যে পুরুষের তুলনায় মহিলার স্থান গৌণ, সুতরাং ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াও পরিবারের মধ্যেই শুরু করতে হবে নারীর সমতা, স্বাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। পরিবারের অন্তর্গত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাই হল অন্যান্য ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারবার ক্ষমতার ভিত্তি।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য এটাও প্রয়োজন যে পুরুষরা লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হবে আর প্রথাগতভাবে চলে আসা 'পুরুষালি'র সংজ্ঞা সম্পর্কে পুনর্বিচার করার জন্য প্রশ্ন তুলতে রাজি হবে।

নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লিঙ্গসাম্য, অপক্ষপাত এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

১। শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

মহিলাদের শিক্ষার অধিকার একটি প্রাথমিক মানবিক অধিকার। ক্ষমতায়নের ফলে মহিলারা যাতে সমাজে এবং গৃহে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষা মহিলাদের তাদের নিজস্ব পরিচয় ও মূল্য সম্বন্ধে অবহিত করে। শিক্ষাই মহিলাদের কাছে সুযোগ এবং বিকল্পের দরজা খুলে দেয় এবং নিজেদের স্বার্থে সঠিক বাছাই করার জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করে। শিক্ষা হল একটি বিনিয়োগ যার সুফল একজন মহিলা সারাজীবন ধরে ভোগ করেন এবং যা একজন মহিলার সারাজীবনের সম্পদ হয়ে থাকে।

ICPD কর্মসূচী অনুযায়ী ''উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়নের পক্ষে যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, শিক্ষা এবং প্রজননগত সুস্বাস্থ্য হল তা অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম''।

শিক্ষা হল মহিলাদের ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি কারণ এর ফলেই মহিলারা সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে পারে, নারীর চিরাচরিত ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে এবং নিজেদের জীবন বদলে ফেলতে পারে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে সমগ্র সমাজ তার সুফল ভোগ করে। পুরুষদের লেখাপড়া শেখালে দারিদ্র্য ও উন্নয়নের উপর যে প্রভাব পড়ে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে তার চেয়ে বেশি পড়ে। শিশুর স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং শিশুমৃত্যুর হার কমানোয় এটি সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী উপাদান। মহিলাদের শিক্ষা পরিবারের আয়তনের ওপরেও প্রভাব ফেলে। একজন মহিলা যত বেশিদিন ধরে শিক্ষালাভ করে তার মধ্যে তত কমসংখ্যক সন্তানধারণের প্রবণতা দেখা যায়।

সমীক্ষা এই তথ্যটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যে, উন্নয়নের জন্য সবরকম বিনিয়োগের মধ্যে নারীকে শিক্ষাদান সবচেয়ে বেশি সুফল দেয় এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য এটি একটি অপরিহার্য শর্ত। শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলারা তাদের বিভিন্ন ভূমিকা বেশি ভালোভাবে পালন করতে পারে — কি কাজের ক্ষেত্রে কি গৃহকোণে অথবা সংঘবদ্ধ জীবনে — এবং নিজেদের সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

দুশোটি উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বব্যাঙ্কের তরফ থেকে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, যেসব দেশ মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশী পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ করেছিল তাদের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটেছে। এছাড়াও, যেখানে মহিলাদের শিক্ষাপ্রাপ্তির স্তর নিম্নাভিমুখী, সেইসব দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম জন্মহার, কম শিশুমৃত্যু এবং প্রসূতি মৃত্যু এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই উচ্চতর আয়ুর হার দেখা গেছে।

গবেষণায় এও দেখা গেছে যে শিক্ষা যাতে পরিবর্তন আনতে পারে এবং জনন ক্ষমতাকে জোরালোভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার জন্য একজন মহিলাকে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার গণ্ডী পেরোতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অবধি শিক্ষাপ্রাপ্তি প্রায়শই পেশাদারী জীবনের বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত হওয়ার চাবিকাঠি। যে মহিলাদের বিদ্যালয়ে যাবার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাদের তুলনায় যে সব মহিলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

স্তরের শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা অনেক কিছু পরিপাটিভাবে সাধন করতে পারেন। একইভাবে শিক্ষা AIDS কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও সাহায্য করতে পারে। একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলার যে ঝোঁকগুলি আসতে পারে তা হল ঃ

- দেরি করে বিয়ে করতে চাইবে এবং সন্তানধারণ পিছিয়ে দিতে চাইবে।
- বারবার গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার শরণাপন্ন হবে (যে মহিলার বিধিবদ্ধ শিক্ষা নেই তার চেয়ে গড়ে আড়াইবার বেশি এবং বেশি কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করবে)।
- অধিকতর স্বাস্থ্যপরিষেবা নিতে চাইবে, নিজেরা অধিকতর স্বাস্থ্যবতী হবে, সন্তান প্রসবকালীন ঝুঁকি কম থাকে এবং এঁদের সন্তানরা অপেক্ষাকৃত বেশি দীর্ঘজীবী হয়।
- তারা নিজেদের সমস্যার কথা নিজেরাই বলতে পারে, স্বামীর সঙ্গে বেশি পরিমাণে বোঝাপড়া করতে পারে, বিশেষ করে সন্তান সংখ্যা এবং সন্তান ধারণের সময় নির্ধারণ সম্পর্কে পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে সমান সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।
- চাকুরি পাবার সুযোগ বেশি থাকে, তা উৎপাদনশীলতা ও আত্মসম্মান বর্ধিত হয়ে আত্মবিশ্বাস আসে যাতে সংঘবদ্ধ কাজে সে অংশগ্রহণ করতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার চাহিদা বাড়াবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার মান বাড়াতে হলে (যাতে বেশি সংখ্যায় ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে নাম লেখাবে এবং তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় টিকে থাকবার হার বর্ধিত হবে) নিচের বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে হবে -

- বেশিসংখ্যায় মহিলাশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ দিতে হবে; বিশেষ করে তাদের নিজের সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে হলে ভালো হয়।
- বেশি সংখ্যায় জনগোষ্ঠীভিত্তিক (কম দূরবর্তী) বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- ঘণ্টা, দিন এবং ঋতুপরিবর্তনের হিসেব মাথায় রেখে বেশি নমনীয় ধরনের রুটিন তৈরি করতে হবে।
- ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের জন্যে অধিকতর গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে এমনকি প্রয়োজন মত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মান বাড়াতে হবে এবং পিতামাতাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তাঁরা মেয়েদের স্কুলে পাঠান।
- বেতন মকুব করতে হবে অথবা বই এবং পোষাক যোগানোর ও ছাত্রীদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ICPD র কর্মসূচী বলেছে সব দেশের উচিত বালিকা / মহিলাদের শিক্ষা শুরু এবং শেষ করা নিশ্চিত হওয়ার মূল্য বুঝতে পারা এবং শিক্ষার সমস্ত উপকরণে যাতে লিঙ্গবৈষম্য না থাকে ও স্ত্রী পুরুষের অসাম্য দৃঢ়মূল না হয় তা দেখা।

বালক বালিকা উভয়েরই শিক্ষা কর্মসূচীতে যৌথ দায়িত্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে, যখন তাদের শিক্ষা শুরু হবে তখন থেকেই বাড়িতে নিজেদের প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া এবং গৃহসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছেলে মেয়ে উভয়ই স্ত্রী পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে যাতে গতানুগতিকতার বাইরে চিন্তা করতে শেখে সেটা দেখা খুব দরকার।

যে সব পুরুষ আইন প্রণেতা, শিক্ষা-মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, বিদ্যালয়ের প্রশাসক, পাঠক্রম- প্রণেতা, শিক্ষক এবং পিতা-সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁরাই এটা সুনিশ্চিত করবেন যাতে বালিকারা স্কুলে আসতে পারে, টিকে থাকতে পারে আর এমন শিক্ষা ও দক্ষতা পেতে পারে যা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে সমান মর্যাদা অর্জনের জন্য প্রয়োজন। বালকদেরও নিজেদের ভূমিকা নতুন করে ভাবতে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নারীদের সম্বন্ধে ভাবতে শেখাতে হবে।

২। <u>চাকরির নাগাল পাওয়া</u>

চাকরি হাতে পেলে মহিলারা পারিবারিক আয় বাড়াতে পারেন; যা আরও ভালো খাদ্যদ্রব্য, থাকার জায়গা এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ সুবিধে গুলো সংগ্রহ করার পথ প্রশস্ত করে। আরও বেশি লেখাপড়া করার সুয়োগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ মহিলাদের চাকরিতে পদোন্নতিতে এবং সমাজের উচ্চতর স্তরে উঠতে সাহায্য করে।

সমীক্ষা দেখিয়েছে যে মহিলাদের কর্মসংস্থান তাদের পরিবারের আয়তন এবং সব দিক দিয়ে ভালো থাকার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে। মহিলাদের চাকরি পাওয়া তাদের পারিবারিক আয়তন ও জননক্ষমতা হ্রাস করাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাবিত করে ঃ

- চাকুরিরতা মহিলারা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে বিয়ে করে, বিশেষত চাকরিটি যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ এনে দেয়। এর ফলে অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য বিবাহ করার আকাঙ্খা কমে যায়।
- যখন 'মাতা' এবং 'কর্মরতা' দুটি ভূমিকার একেবারেই সমন্বয় করা দুরূহ হয়, বিশেষ করে যখন কাজের জায়গাটি বাসগৃহ থেকে দূরে হয় এবং চাকরিটি মহিলাটিকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আর্থিক প্রতিদান দেয়, এই ক্ষেত্রে আরেকটি সন্তানের জন্য চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবা মহিলাটির পক্ষে খুবই কঠিন।
- মহিলারা যখন কাজ করবেন, তখন তাঁদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করার বন্দোবস্ত আছে কী না।
- সমীক্ষা দেখিয়েছে যেসব মহিলা আধুনিক শিল্প ক্ষেত্রে কাজ করেন তারা কম সন্তানের জননী হয়। তার ফলে উর্বরতা কমে যায়।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত।

নিজেদের উপার্জন থেকে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার প্রবণতা মহিলাদেরই বেশি। ফলে পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহিলাদের উপার্জন বেশি ফলপ্রসূ হয়।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা ভবিষ্যৎমুখী অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে দূর করতে হবে। পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সমাজের ধারণযোগ্য উন্নতির জন্য অর্থনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান নীতিগুলির মধ্যে যেগুলি মহিলাদের প্রতিবন্ধক সেগুলি অবশ্যই পাল্টাতে হবে। ঋণগ্রহণ, সম্পত্তি এবং বাজার সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার দিতে হবে এবং এসব সুযোগ পেতে গেলে পরিবারের পুরুষ সদস্যের সম্মতি নেবার আর প্রয়োজন থাকা উচিত নয়। যে নীতিগুলি মহিলাদের পারিবারিক, গার্হস্থ্য এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভূমিকাকেই মূল্যবান মনে করে সেগুলি পরিবর্তন করতে হবে। এই সঙ্গেই পুরুষরা যাতে পরিবারে ও সন্তান পালনের কাজে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পুরুষমানুষেরা — যাঁরা অর্থনৈতিক কর্মপন্থা আর আইন বানানোর এবং বদলানোর কাজে যুক্ত আছেন — তাঁদের মানতেই হবে যে এটা শুধু মহিলাদের জন্যই নয়, সমগ্র সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

৩। <u>প্রজননগত স্বাস্থ্যসহ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি</u>

সুস্বাস্থ্য হল সেই শক্ত জমি যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একজন মহিলার কর্মক্ষমতা, সন্তানের জন্মদান এবং তাদের দেখাশোনা করা, ঘরের কাজ করা এবং কৃষিক্ষেত্রে ও অন্যান্য সমষ্টিগত কাজে অংশ গ্রহণ করা। রোগহীনতা সুস্বাস্থ্যের একটি মাত্রা মাত্র। মহিলাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ধারণ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখতে হবে —

(i) পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, (ii) নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান, (iii) বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ, (iv) পরিবারের অন্য সদস্য এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে পারিবারিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা যাতে ঠিক সময়ে সঠিক বিকল্পটি বাছা যায়, (v) সন্তানের সংখ্যা, সন্তানদের মধ্যে ব্যবধান রাখার জন্যে গর্ভধারণের সঠিক সময় সম্পর্কে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা।

৪। **<u>মহিলা এবং বালিকাদের বিরুদ্ধে বেআইনী বলপ্রয়োগের অবসান</u>**

এই সমস্যার মোকাবিলা করবার জন্য নানা উপায় ভাবা হয়েছে। তার মধ্যে আছে বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং বেআইনী বলপ্রয়োগের শিকার মহিলাদের জন্যে অনুসারী পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

এইসব উদ্যোগের অধিকাংশই মহিলারা নিজেরা নিয়েছেন। এই পন্থাগুলির দীর্ঘকালীন সাফল্য পুরুষ সমাজের এগুলির সঙ্গে জড়িত থাকার ওপর নির্ভর করবে। এর মধ্যে থাকবে বহুদিন ধরে ফেলে রাখা সমস্যার মোকাবিলা করা এবং মহিলাদের সাথে একযোগে এর অন্তর্নিহিত সামাজিক বিষয়গুলোর মুখোমুখি হওয়া।

অমার্যাদা থেকে মহিলাদের বাঁচানো বা অমর্যাদাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কার্যকারিতা বেশিরভাগ আইনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল।

মহিলাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ঘটনা নির্মূল করতে হলে আইন প্রণেতা, বিচারক, পুলিশ, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা দেবার কাজে যুক্ত মানুষ, শিক্ষক, স্বামী এবং পিতা সব পরিচয়েই পুরুষদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই সমস্যার পেছনের বদ্ধমূল সাংস্কৃতিক কারণগুলি খুঁজে বের করে পাল্টানোর জন্য তাঁদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পুরুষ নিজেদের যে চোখে দেখেন আর মেয়েদের যে চোখে দেখেন তার আমূল পরিবর্তনও এর মধ্যেই পড়ে। পুরুষদের নিজেদের সম্বন্ধে এমন যত্নশীল মানুষের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে যারা জীবন সঙ্গিনীদের প্রতি সযত্ন মনোযোগ দিতে সক্ষম। এই ধরনের ভাবমূর্তি গড়ে উঠলে মহিলাদের প্রতি বলপ্রয়োগের ঘটনা অনেক কমে যাবে — এই মর্মে বেশি করে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যতদিন মহিলারা হিংসাত্মক আচরণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচতে না পারবেন, ততদিন তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন হবে না।

৫। রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা

অতীতে মহিলারা শুধুমাত্র বস্তুবিশেষ এবং সম্পত্তি বলে গণ্য হতেন, আজ তাঁরা পুরুষদের মত সমস্ত আইনগত অধিকার এবং সুবিধে পান এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন — এই অবস্থায় পৌঁছতে কয়েক শতাব্দী লেগে গেছে।

১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় মহিলাদের বিরুদ্ধে সবরকম বৈষম্যের অবসান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা ১৯৯৪-এ অনুমোদিত হয়, সেটাই এযাবৎ বোধহয় সবচেয়ে জোরালো এবং প্রভাব বিস্তারকারী বিবৃতি। এই বিবৃতিতে যেখানে যত বৈষম্যমূলক আইন এবং নিয়মকানুন আছে, আর সনাতন প্রথা এবং আচার ব্যবহারের মধ্যে যেখানে লেশমাত্র বৈষম্যমূলক ভাবনা আছে, সেগুলোকে সমাধিস্থ করতে হবে আর মহিলাদের মর্যাদা যাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে পারে তেমন সব ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলের দায়বদ্ধতা উচ্চারিত হয়েছে। একশ আটত্রিশটিরও বেশি দেশ ১৯৯৪ সালের মধ্যে এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে।

তার ফলে এর মধ্যে নানাভাবে মহিলাদের আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যথা —

- সংবিধানে একটি সমতার ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা।
- ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং রাজনৈতিক পদ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া।
- মহিলারা যাতে নিজেদের যোগ্যতায় বাণিজ্যিক লেনদেন করতে পারেন তার প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
- মহিলারা নিজের নামে সম্পত্তি রাখতে পারবেন সেই অনুমতি দেওয়া।
- উত্তরাধিকারী হবার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার প্রদান করা।
- কর সংগ্রহ ব্যবস্থায় মহিলাদের স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে গণ্য করা।
- মহিলাদের নাবালক সন্তানের লালন-পালন এবং নিজের প্রযত্নে রাখার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।
- বিবাহের সময় মহিলার সম্মতি দরকার বলে বিধান দেওয়া।
- আদালতে নিজের নামে মামলা করবার অনুমতি দেওয়া।
- বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা আইনের ভিত্তিতে পৃথক থাকার জন্য মহিলারা পদক্ষেপ নিতে পারবেন এই অনুমতি দেওয়া (UNFPA 1995)।

এর মধ্যে অনেকগুলো, যথা সম্পত্তির অধিকার ঘটিত, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিত, বাণিজ্যিক লেনদেনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি আইনগুলো মহিলাদের ক্ষমতায়ন সাধিত করতে অত্যাবশ্যক। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্যে আইন সংস্কার ও তার যথাযথ প্রয়োগ, দুটিই দরকার।

মহিলাদের মর্যাদার আইনগত স্বীকৃতি এক জিনিষ এবং সেই মর্যাদার পরিপূর্ণ উপভোগ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। অনেক সমাজেই এমনসব মহিলাগোষ্ঠী থাকেন যাঁরা নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে অবহিত নন এবং আইনগত পরামর্শ নেওয়া বা মামলা করবার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের নেই। অধিকাংশ আইনই ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষিত লোকের সাহায্য ছাড়া কদাচিৎ বোধগম্য হয়। খুব সহজ ব্যাখ্যা করা বই যাতে ভাষার ধোঁয়াটেভাব কাটিয়ে আইনগত ধারণা এবং নীতিসমূহ সোজাসুজিভাবে বলা আছে; জনসাধারণের উপকারে আসার মত তেমন জিনিষ আজও দুর্লভ।

গণমাধ্যমগুলির উচিত আইনগত জ্ঞানের প্রসার হয় এমন সব অনুষ্ঠান সাধারণ লোকের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করা। মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা দিতে হবে। একই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। আইন এবং কর্মসূচী আলোচনা করতে হবে বিদ্যালয়গুলিতে এবং বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্রে। বেসরকারী সংস্থাগুলি বিশেষ করে মহিলা সংস্থাগুলিকে মহিলাদের সুবিধার জন্যে আইন তৈরির ব্যাপারে নিজেদের অনুপ্রাণিত করার অভিমুখে কাজ করতে হবে।

অর্থনীতিতে এবং পরিবারের মধ্যে মহিলার ভূমিকাকে বিশেষ মূল্য দিয়ে রাজনৈতিক স্তরে, সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রগুলির একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে তা অর্থনৈতিক নীতির ওপর প্রভাব ফেলে। মহিলাদের সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৈরি আইনগুলিকে শুধু কাগজে-কলমে বন্দী রাখলেই চলবে না। সরকারের সমস্ত স্তর থেকে পূর্ণ সমর্থন নিয়ে সেগুলোকে কার্যে রূপায়িত করতে হবে।

ICPD প্রোগ্রাম অব এ্যাকশন ১৯৯৪ -এ বলা হয়েছে যে দেশগুলোকে এইভাবে কাজ করতে হবে যাতে সমস্ত স্তরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এবং জনজীবনে মহিলাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ক'রে যত শীঘ্র সম্ভব তাদের ক্ষমতায়ন করা হয়। এও দেখতে হবে যাতে মহিলারা তাঁদের নিজস্ব বিষয় এবং প্রয়োজনের কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারেন (UNFPA,1995)।

পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে পুরুষদের ভূমিকা অপরিহার্য। সরকারের নেতা, আইনপ্রণেতা এবং বিচারক হিসেবে তাঁরা সুনিশ্চিত করতে পারেন যে CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) শুধুমাত্র অনুমোদন করাই হয়নি, কার্যকরও করা হয়েছে। এমন আইন প্রণীত এবং প্রয়োগ করতে হবে, যেগুলি শুধু লিঙ্গ সম্পর্কিত পক্ষপাত মুক্তই নয় সক্রিয়ভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ধিত করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য কমিয়ে দেবার জন্যও তাঁরা কাজ করতে পারেন। রাজনীতি এবং বিচারব্যবস্থায় মহিলারা যুক্ত হলে তা মহিলাদের এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে সুফল প্রদায়ী হবে। সত্যিকারের পরিবর্তন যদিও সময়সাপেক্ষ, কিন্তু শিক্ষা সেই লক্ষ্যের অভিমুখে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষাই পারে অল্পবয়সী ছেলেদের 'পৌরুষ'-এর একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা শেখাতে যা আধিপত্যভিত্তিক সংজ্ঞার পরিবর্তে যৌথ দায়িত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। শিক্ষাই পারে মেয়েদের অধিক সুবিধে দিতে যাতে তারা নিজেদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

- একটি বালিকাকে শিক্ষা দাও, তার ভালো এবং মন্দের মধ্যে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা জন্মাবে। তাকে নিরাপদে লালন-পালন করে বড় হয়ে ওঠার সুপরিবেশ দাও, সে তার সমাজকে উত্তরোত্তর ভালোর দিকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা অর্জন করবে।
- তাকে সন্তানধারণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দাও তাহলে সে এবং তার ভাবী সন্তানেরা সুস্বাস্থ্যে ভরা ভবিষ্যৎ পাবে।

এর জন্যে সেইসব নীতি এবং কর্মসূচীকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে যেগুলো পরিবারে বাবা-মা উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গনিরপেক্ষতা বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস করতে হলে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্ক জোরালো করে তোলা ছাড়া গতি নেই।

নীতি এবং কর্মসূচীগুলিকে সেইসব দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বদলানোর কথা মাথায় রেখে তৈরি করতে হবে যেখানে অল্পবয়সী মেয়েরা ঘর সামলানোর কাজেই শিক্ষানবিশি করে চলে, উপার্জনকারী দক্ষতাকে

আমল দেওয়া হয় না, আর যেখানে যুবকেরা পরিপাটি করে পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে না কারণ পিতার সন্তানদের যত্ন করাকে সমাজ নিরুৎসাহিত করে।

বাস্তবসম্মত নীতি ও কর্মসূচীতে নিম্নরূপ বিষয়গুলি থাকা উচিত—

- একটি আইনি ও নৈতিক কাঠামো যা বিবাহে এবং মাতাপিতার সঙ্গো সন্তানের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করে।
- অ-চিরাচরিত পরিবার এবং পরিবারস্থ পুরুষের সঙ্গো শিশুদের হৃদ্য মেলামেশা করার বিধান থাকে।
- শিক্ষা এবং গণমাধ্যমের ব্যবহার যাতে লিঙ্গা সাম্য, লিঙ্গা অপক্ষপাত এবং দায়িত্বশীল যৌন ব্যবহার সমৃদ্ধ হয়।

পরিবার সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ নীতি তরুণদের শেখায় –

(i) দায়িত্বশীল যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে, (ii) 'বিবাহ' এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কের তাৎপর্য ও দায়িত্বসমূহ, (iii) মাতাপিতা হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো যেসব দায়িত্ব এসে পড়ে।

সমাজের উচিত বিদ্যালয়, সামাজিক কর্মসূচী এবং গণমাধ্যমে এইসব বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা।

বিশেষ করে প্রয়োজন মেয়েদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা যাতে তারা নিজেদের ও ভবিষ্যত সন্তানের জন্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত হয়। ছেলেদের শেখাতে হবে যে 'পিতৃত্ব' বলতে বোঝায় সন্তানদের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব পালন আর সেইসঙ্গো তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও মায়ের সঙ্গো ভাগ করে নেওয়া।

তৃতীয় অধ্যায় | জীবনশৈলী শিক্ষা

● পটভূমিকা ঃ অন্য সব প্রাণীর মতো একটি মানবশিশু স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হয়। তার শরীর-মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ কেমন হবে তা সেই শিশুর পরিবেশের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার পুষ্টি, তার পরিবারের শিক্ষাসংস্কৃতির মান, তার সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই সমগ্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই প্রত্যেক শিশু বড় হয়। বিশেষ বয়সে এসে বড় হওয়াটা এক নতুন মাত্রা পায়। কিশোর-কিশোরীরা একটি বিশেষ অর্থে বড় হয়ে ওঠে। তাদের জীবনে পর্যায়ান্তর ঘটে। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের এই প্রক্রিয়াটি কয়েক বছর ধরে চলে। এই সময়টাকেই বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের বয়ঃক্রম নিয়ে মতপার্থক্য আছে। বর্তমানে সাধারণভাবে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স বয়ঃসন্ধির কাল বলে গণ্য হয়। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শরীরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। যৌবনপ্রাপ্তির এই লক্ষণগুলি পরিণত বয়সের সব মানুষই জানেন। বিশেষত শিক্ষককুল এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাই সেগুলির বিবরণ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু শরীরে এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় সে বিষয়ে আমরা প্রায়শই অনবহিত অথবা উদাসীন থাকি। আকস্মিকভাবে যখন পরিবর্তনের পালা এসে পড়ে তখন ছেলেমেয়েরা এর অর্থ বুঝতে পারে না। এই বিকাশ যে স্বাভাবিক, সকলের জীবনেই এই পর্ব আসে সে উপলব্ধি তাদের থাকে না। এ বিষয়ে পূর্ব ধারণা না থাকার ফলে তাদের মনে নানারকম আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা, এমন কি অমূলক অপরাধবোধ জন্ম নেয়। কিন্তু বিষয়টা জেনে নেবার কোনো পথ তাদের কাছে খোলা থাকে না। শরীরের গোপন অঙ্গ নিয়ে খোলামেলা কথা বলা বাবা-মা বা অন্য গুরুজনদের পক্ষে অস্বস্তিকর। ছেলে-মেয়েরাও প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করে। অবদমিত কৌতূহলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে, তাদের মন অস্থির, জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। তখন তারা অন্য উপায় খোঁজে। সমবয়সীদের কাছে কথা পাড়ে। তারাও সমান অজ্ঞ। সুতরাং ভুল তথ্য ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে তারা চূড়ান্ত বিভ্রান্তির শিকার হয়।

জীবন গড়ে তোলার পথে এই অস্থির অবস্থার সুদূরপ্রসারী কুফল আছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যালয়স্তরে যৌনশিক্ষার ধারণাটি অনেকদিন আগেই রূপ নেয় এবং অনেক দেশে তা প্রবর্তিত হয়। এই শিক্ষাক্রম মূলত যৌন অঙ্গসমূহের বিকাশ, প্রজনন প্রক্রিয়া ও প্রজনন স্বাস্থ্যের (Adolescence Reproductive and Sexual Health – A R S H) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। পরবর্তী কালে বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করলেন যে শুধু শারীরবৃত্তীয় জ্ঞান বয়ঃসন্ধির সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বড় হয়ে ওঠার সময় শরীরের অজানা রহস্যজনিত উদ্বেগ ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতে অন্যতর পরিবর্তন আসে যার ফলে উত্তরজীবনে তাদের সামাজিক সুস্থতাও বিঘ্নিত হয়। তাদের মনের চাহিদা বেড়ে যায়। স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন, সাহচর্য, সমর্থন প্রভৃতি পাবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। বাবা-মায়ের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে থাকে, সমবয়সীদের সঙ্গ বেশি আকর্ষণ করে। আজকের দিনে নানা কারণে ছোট পরিবারের লক্ষ্য আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলস্বরূপ বাড়িতে নিঃসঙ্গতা ছেলেমেয়েদের এই যন্ত্রণাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। বড় হয়ে ওঠার স্বীকৃতি

চায়, আবার সামান্য কারণে নিজেকে অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত মনে করে। পরিবারে এবং অন্যত্র সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলাটা তাদের সামনে এক নতুন সমস্যা হিসেবে হাজির হয়। যৌবনপ্রাপ্তির সময় কিশোর-কিশোরীরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তাদের মনে যৌনতাবোধ ও কিছুটা যৌন চাহিদা জেগে ওঠে।

আসলে এগুলি সমস্যা নয়, বড় হয়ে ওঠার স্বাভাবিক লক্ষণ। এই পরিবর্তন, এই চাহিদা, প্রশ্ন ও সংশয়সমূহকে বুঝে সঠিকভাবে মেটাতে এবং সঠিক দিকে পরিচালিত করতে পারলে তরুণ-তরুণীদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে, তারা সুস্থ সৃজনশীল জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এই পরিচালনায় যদি ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে এদের জীবনে নানাবিধ বিপত্তি আসবে, সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। এই বয়সে কিশোরদের যে বিশেষ অনুভূতি তার কিছুটা মর্মস্পর্শীভাবে চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে—মামারবাড়িতে বড় হয়ে ওঠা ফটিকের কাহিনিতে। প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করা হল।

"তেরো-চৌদ্দো বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না ; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।"

অতএব যৌবনাগমের শারীরিক লক্ষণের সঙ্গে মানসিক ও সামাজিক দিকগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখন স্বীকৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যালোচনার সূত্রে কিছু বিবর্তনের পথ বেয়ে যৌন শিক্ষা এখন 'বয়ঃসন্ধির শিক্ষা' নামে বেশি গ্রহণযোগ্য। পরিবারে ও সমাজে যথাযথভাবে জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার জন্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। প্রাসঙ্গিক দক্ষতাগুলিকে 'জীবন-দক্ষতা' বলা হয় এবং এগুলিকে সমন্বিত করে যে ব্যবস্থা তাকে বোঝাতে 'জীবনদক্ষতার শিক্ষা' (life skills education) নামটিও প্রচলিত আছে।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যৌনতা বিষয়ক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি আমাদের দেশেও অনেকদিন আগেই উত্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক চলেছে কিন্তু বরাবরই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরকম একটি শিক্ষাক্রম চালু করার পক্ষে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম সুপারিশ হয়েছে ১৯৯৩ সালে। কিন্তু

তা রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ দেখা যায়নি। এন.সি.ই.আর.টি. ঐ বছর এই বিষয়টি প্রবর্তন করার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তারাই যখন ২০০০ সালে বিদ্যালয়স্তরের জন্য জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো সুপারিশ করল তখনও এমন কোনো কার্যক্রম যুক্ত করতে বলেনি। পাঠক্রমের মাধ্যমে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতাসমূহ গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে তারা পরামর্শ দিয়েছে সেখানে শুধু বলা হয়েছে "যৌনসংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা এবং বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।"

আমাদের প্রচলিত মানসিকতায় নরনারীর যৌন সম্পর্কটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এই সমাজের যুগলালিত মূল্যবোধ অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত যৌনসম্পর্ককে অনুমোদন করে না। প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্ভোগকে আমরা অনৈতিক এবং সমাজ-বিধ্বংসী বলে গণ্য করি। স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের মধ্যে একটি পবিত্র গোপনীয়তা আছে যাকে আমরা মর্যাদা দিয়ে থাকি। তাই যৌনতা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে আমাদের জড়তা আছে। নরনারীর যৌন অঙ্গসমূহ সেই গোপনীয়তার আওতায় পড়ে। এই বিষয়গুলি পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হলে পাঠ্যপুস্তকে লিখতে হবে, শ্রেণিকক্ষে পড়াতে হবে, পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে হবে। আমাদের সমাদৃত মানসিকতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এগুলি মেলে না। তাই এ হেন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে আমাদের আড়ষ্টতা অস্বাভাবিক নয়।

● সাম্প্রতিক তাগিদ ঃ কিন্তু সমাজ তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না। কালের গতিতে নতুন-পুরাতনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার রূপান্তর ঘটে চলেছে। নতুন পরিস্থিতি এনে দিচ্ছে নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনা, জেগে উঠছে নতুন নতুন চাহিদা, শিথিল হয়ে যাচ্ছে চিরায়ত মূল্যবোধ, ভেঙে পড়ছে সমাজের অনুশাসন। আমাদেরও ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে কিছু পুরানো চিন্তা ও অভ্যাস।

সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ভেঙে নারীসমাজকে যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা প্রসারিত করার উদ্যোগ চলছে। এর অন্যতম ফল হিসেবে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব আগের তুলনায় অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব সরে যাচ্ছে, ঘুচে যাচ্ছে অর্থহীন অনাবশ্যক আব্রু। এটা অবশ্যই সমাজ বিকাশের এক সুস্থ লক্ষণ। কিন্তু এই কাম্য স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে নানা পন্থায় অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও উদ্দাম জীবনধারার প্ররোচনা সৃষ্টি হচ্ছে মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে চোখ রেখে। যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক অনুশাসন বা আচরণবিধি থাকবে না, সবটাই অবাধ ও মুক্ত হবে— এমন একটি বাতাবরণ পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বিশ্বায়নের দাপটে যে শিকড়বিহীন সংস্কৃতির প্রবাহ আমাদের গ্রাস করছে, আমাদের জীবনচর্যাকে চালিত করতে চাইছে তা এই বিকৃতিতে প্রভূত পরিমাণ ইন্ধন যোগাচ্ছে। গণমাধ্যমের শক্তিশালী অংশ এই অসুস্থ প্রবণতাকে শহর-গ্রামে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অবাস্তব এক রঙিন স্বপ্নের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে যার মর্মকথা— নির্বিচার অবারিত যৌন সম্ভোগেই জীবনের সার্থকতা। নরনারীর জীবনের একান্ত গোপনীয় মাধুর্যকে হাটের পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। নারী মুক্তির অতি প্রয়োজনীয় আন্দোলনকে পরিকল্পিতরূপে বিপথগামী করছে।

প্রবল আর্থসামাজিক টানা-পোড়েনের ভেতর আমাদের তরুণ সমাজ এমনিতে গভীর হতাশা ও বিভ্রান্তির শিকার। সেই সঙ্গে এইসব বর্ণাঢ্য প্রচার আর প্রলোভন-জাগানো সম্প্রচার তাদের পথভ্রষ্ট করছে, জাগিয়ে

তুলছে অসুস্থ কৌতূহল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ঔৎসুক্য। পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধনগুলি বিপর্যস্ত হচ্ছে। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যৌন অনাচার। সমাজের কিছু মান্য-গণ্য অংশও ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এই যথেচ্ছাচারের পক্ষে সওয়াল করছেন। সামাজিক শৃঙ্খলাকে সেকেলে ধারণা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। এই অস্থির পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিপত্তি। মারাত্মক ড্রাগের নেশা, অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার, আর এইডস্-এর বিস্তার আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। অনেক মানুষই এখন পুরোনো চিন্তা ও অভ্যাস ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। তাঁরা উপলব্ধি করছেন, যা কু-পথে প্রকাশ্যে চলে আসছে, তাকে গোপন রাখার ব্যর্থ চেষ্টা না করাই সমীচীন। তাই বিজ্ঞানসম্মত যৌনবিষয়ক শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের বিরোধিতা বা আপত্তি ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। সামাজিক স্বাস্থ্যভাবনার অঙ্গ হিসেবেই এই ধারণাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

● তথাপি সংশয় ঃ পুরানো চিন্তায় নাড়াচাড়া পড়েছে এটা ঠিক। তথাপি অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে এ বিষয়ে কিছু সোচ্চার আপত্তি এখনও আছে। পর্ষদ বার্তার ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি অত্যন্ত সুলিখিত নিবন্ধে এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। (বয়ঃসন্ধির সমস্যাপূরণ ঃ কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয়' - শ্রী জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়)। এই চিন্তার কয়েকটি মূল বিষয় হল—

(ক) বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষা প্রবর্তনের প্রকৃত কারণ সামাজিক ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে আপস করা এবং এই অনাচারের দায় অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই প্রস্তাবে বয়স্ক অভিভাবকের সুবিধাবাদী মানসিকতার পরিচয় আছে। তাঁরা যেন বলে দিচ্ছেন— 'এই তো পরিস্থিতি, এখন তোমরা তোমাদের সামলাও'।

(খ) উপস্থ কর্মেন্দ্রিয় সম্পর্কে সামাজিক শিষ্টাচারকে ভেঙে ফেলার 'ষড়যন্ত্র বর্তমান বাণিজ্যিক সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রবল এবং প্রকৃতপক্ষে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের এই অভ্যাস-রিক্ততার সুযোগে তাদের প্রথমত দিশাহারা করে পরে তাদের যৌনশিক্ষার মধ্যে চিত্তপ্রশমনের উপায় খোঁজা হচ্ছে বাণিজ্যশাসিত কিছু রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

(গ) যৌনশিক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে তাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং অজানা বিষয়ে অশুভ কৌতূহল নিবৃত্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এই শিক্ষার আয়োজন। কিন্তু সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে যে এর ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এই শিক্ষা ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'চিত্ত বিক্ষেপকারী তপ্ত ভাবনা-চিন্তার বিষয়' হয়ে উঠতে পারে।

(ঘ) একটি নতুন বিষয়ের প্রবর্তন পাঠক্রমের ভারবৃদ্ধি করবে। তাছাড়া 'এই গুরুভার বিষয়ের উত্তেজক প্রসঙ্গগুলি' নবযৌবন-প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের 'বয়সোচিত কোমল এবং নির্দায় মানসিকতাকে' সংক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে।

(ঙ) যৌন সম্পর্কঘটিত রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়স্তরে যৌনশিক্ষা প্রবর্তনের চেয়ে বেশি কাম্য এমন একটি 'সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যার চরিত্র লক্ষণের মধ্যেই থাকবে প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহ-ব্যতিরিক্ত যৌন জীবনের উপর শাসন এবং নিন্দা যাতে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা জীবনের অন্যান্য নীতিবোধ গড়ে তোলার মতো এ বিষয়েও তদনুযায়ী নীতিবোধ গড়ে তুলতে পারে।'

(চ) 'মানুষের যৌনজীবন সম্পর্কে পারিবারিক পাঠশালাই সর্বাধিক কার্যকরী'। নানা কারণে সেই পরিবার ব্যবস্থাটি ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু বিকল্প হিসেবে যদি স্কুলপাঠ্যের আশ্রয় নেওয়া হয় তবে সেই 'অকালীয় ব্যস্ততার কুফল' ফলতে পারে।

(ছ) বয়ঃসন্ধিকালের দেহমনের গোচরীভূত পরিবর্তনগুলি নিয়ে তাদের যাবতীয় জ্ঞাতব্য মা-বাবার কাছ থেকে খোলা মনেই জেনে নিতে পারে। এ জন্য 'ছেলেমেয়েদের যৌন শিক্ষার প্রয়োজন নেই, বরং কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে তাদের মা-বাবার এ বিষয়ে কিছু শিক্ষার যাতে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় আলোর সন্ধান দিতে পারেন।'

ওপরে সন্নিবেশিত মন্তব্যগুলি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য এবং অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভাবনার প্রতিফলন। এই যুক্তিগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করে এই প্রস্তাবের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য নিচে দেওয়া হ'ল—

১। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকৃতি এবং তজ্জনিত সাংস্কৃতিক ও নৈতিকতার অবক্ষয় যে মূল সমস্যা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। বাণিজ্যিক সমাজব্যবস্থাই নিঃসন্দেহে এই অধঃপতনের প্রধান কারণ। এর সামগ্রিক ফল হিসেবে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক অনুশাসন ভেঙে পড়ছে, বিপন্ন হচ্ছে সভ্যতা। এই অসুস্থতার লক্ষণ সমাজের সব ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে। তরুণসমাজকে পরিকল্পিতভাবে বিপথচালিত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজ বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ সবার কণ্ঠেই শোনা যাচ্ছে। এমন কি বিদ্যালয় শিক্ষার পরামর্শদানের কেন্দ্রীয় সংস্থা এন.সি.ই.আর.টি ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পাঠক্রমের যে কাঠামো সুপারিশ করেছিল সেখানেও শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "It (education) must also lead to a non-violent and non-exploitative social system" (Para 2.5, P.39).

কিন্তু রাতারাতি তো এই সমাজটাকে পাল্টে দেওয়া সম্ভব নয়। সে এক দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রাম। এজন্য প্রয়োজনীয় চেতনা সঞ্চারের কাজই এখনও বিশেষ এগোতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে এই অধঃপতনের সর্বনেশে প্রভাবগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার উপায় নেই। সামাজিক পরিবেশ যদি নিষ্কলুষ থাকত, বয়সোচিত কোমল, নির্দায় মানসিকতাকে সংক্ষুব্ধ করে কোনো কুটিল ক্লেদাক্ত উপকরণ যদি বাতাসে ছড়িয়ে না পড়ত, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার এই উদ্যোগ প্রয়োজন হত না। পরিস্থিতি স্পষ্টতই তেমনটি নয়। বিশেষ স্বার্থবাহী নাগিনীদের নিঃশ্বাস দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে মারাত্মক গরল। তাই শিক্ষাব্যবস্থার উদার নিশ্চেষ্টতা পরিহাস না হলেও আগামী প্রজন্মের বিপর্যয়ের জন্য পরোক্ষে দায়ী থাকবেই। তাছাড়া, সমাজ পাল্টালেও প্রবৃত্তি, রিরংসা ইত্যাদিকে সংযত ও সংহত করার জন্য যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ, *'উলট জলে মছলি চলে, ভাসি যায় গজরাজ'*।

২। রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির (২০০১-০২) সুপারিশ অনুসারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে নতুন কার্যক্রমটির প্রবর্তন করেছে তা নিছক যৌন শিক্ষা নয়। বরং প্রয়োজনানুগ, সামগ্রিকভাবে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যচেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোনো নতুন পাঠ্যবিষয়ও সংযোজিত হয়নি। 'জীবনশৈলী' পাঠ্যে জীবনবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে কয়েকটি নতুন অংশ যুক্ত হবে। বেশির ভাগ চর্চাই হবে সহপাঠক্রমিক কৃত্যভিত্তিক। এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজমুখী মূল্যবোধসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব

বিকাশের মাধ্যমে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গড়ে তোলা। প্রকৃত প্রস্তাবে এটিতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে মৌলিক শিক্ষার নানাদিকের নির্যাস, চিহ্নিত কিছু জীবনদক্ষতার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয়। এই প্রকল্পের অন্তর্নিহিত ধারণাটিকে সঠিক রূপ দিয়ে এখনও সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। ফলত বিষয়টির লক্ষ্য, চরিত্র ও ব্যাপ্তি নিয়ে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে গেছে।

৩। মারাত্মক 'এইড্‌স্‌' রোগের দ্রুত বিস্তারে সকলেই উদ্বিগ্ন। এই তিক্ত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। অধুনা এই রোগটিকে অন্য অনেক রোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রচেষ্টা বিপত্তি সৃষ্টি করছে। সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিঘ্নিত করছে। বহু সুযোগসন্ধানী সংস্থা ও ব্যক্তি আতঙ্ক ছড়িয়ে তাদের বাণিজ্যিক মুনাফার পথ সুগম করছে। এই কারণেই প্রকৃত স্বাস্থ্য চেতনার সঙ্গে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত সমস্ত শিক্ষা আজ অপরিহার্য। কোনো কোনো মহল যৌনসংসর্গজনিত রোগ প্রতিরোধ করাকেই বয়ঃসন্ধি শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন, প্রচার করছেন। এই একপেশে ভাবনার পরিণতি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন সেই বার্তা—

'যা খুশি করতে পারো, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সংযমের প্রয়োজন নেই, শুধু রোগটিকে এড়িয়ে চলতে শেখো।' আমাদের উদ্যোগ অবশ্যই সেই ধারণার অনুবর্তী নয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামনে যে সুস্থ সামগ্রিক লক্ষ্য আছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। পারিবারিক পাঠশালাটি নানা কারণে যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এটা তো সাধারণ অভিজ্ঞতা। "ছোট পরিবার সুখী পরিবার"--এই মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়েছে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতায়। তবে পরোক্ষাভাবে তা যে কিছু অ-সুখেরও জন্ম দেয় তা তো অস্বীকার করা যাবে না। পরিবারে এখন আছেন শুধু বাবা-মা যাঁরা বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সঙ্গ দিয়ে তাদের নতুন ভাবনা, কৌতূহল, আবেগ ও অনুভূতির সম্পূর্ণ অংশীদার হতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে সন্তান ঠিক কী চাইছে, কোথায় তার অভাববোধ তা-ও বুঝতে পারেন না। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের পিতামাতাদের এ বিষয়ে ধারণারও অভাব আছে। তাঁদেরও শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু কোটি কোটি বয়স্ক নিরক্ষরের দেশে সেই শিক্ষা কবে কার দ্বারা কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে ? আদৌ হবে কি ? কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলেও স্কুলে বিষয়টি পরিকল্পিতভবে পরিবেশন করাই বোধহয় একমাত্র বিকল্প। আজকের স্কুল ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে যখন পিতামাতার ভূমিকা নেবে তখন তারা পারিবারিক বিদ্যালয়ের অভাব যথাসম্ভব মেটাতে পারবে।

- **দক্ষতাসমূহ ও তাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ**

জীবনশৈলী শিক্ষার মূল ধারণার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

১। **শারীরবৃত্তীয় ঃ** সামগ্রিকভাবে শারীরবিন্যাসের অংশ হিসেবে যৌন অঙ্গসমূহ, তাদের কাজ, বিকাশ ও স্বাস্থ্যসম্মত যত্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা দেওয়া যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় নিরসন করা এবং ভুল ধারণা ও বিশ্বাসকে দূর করা যায়।

২। **মানসিক ঃ** উপরিউক্ত প্রসঙ্গে ছেলেমেয়েদের কাছে তথ্য ও ব্যাখ্যা এমনভাবে তুলে ধরতে হবে

যাতে তারা অজ্ঞতা এবং অবদমিত কৌতূহলজনিত উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং অন্যান্য মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

৩। **সামাজিক ঃ** পরিবার থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজে মানুষের সঙ্গো মানুষের সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত আচরণবিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। স্নেহশীল বাবা মা-র সঙ্গো সন্তানের, শিক্ষকের সঙ্গো শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গো সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সঙ্গো সঙ্গো বিপরীত লিঙ্গোর মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। লিঙ্গা সমতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের মনে শুধু ধারণা নয়, বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

৪। **সাংস্কৃতিক ঃ** সমাজকে বোঝার জন্য, সমষ্টিগত জীবনযাপনের মানসিকতা তৈরি করার জন্য উচ্চমানের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহী করা এবং তাদের সৃজনশীলতাকে যথোপযুক্ত অভিমুখে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির আস্বাদ ও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হতে এবং সুস্থ মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জীবনের সর্ববিধ মূল্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি চর্চার অবদান অনস্বীকার্য।

৫। **নৈতিক ঃ** সামগ্রিক অর্থে জীবন-শৈলী শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা বিধানের মাধ্যমে তাদের নৈতিক মান উন্নত করবে। ফলে শিক্ষার্থীরা সমাজের সকলের সঙ্গো যৌথভাবে জীবনপথে চলার মানসিকতা অর্জন করবে। তারা সমষ্টির স্বার্থকে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের উপরে স্থান দিতে শিখবে। সমাজ-স্বীকৃত প্রগতিশীল আচরণবিধিকে তারা শ্রদ্ধা করবে, অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে পারবে।

- **মানসিক স্বাস্থ্য ঃ** কোন ব্যক্তির জীবনে শরীরের স্বাস্থ্যের মত মনের স্বাস্থ্যেরও গুরুত্ব অপরিসীম। শরীর যেমন কখনো সুস্থ থাকে কখনো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে মনও তেমন কখনো সুস্থ আবার কখনো বিচলিত বা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলা যায় যে (ক) মানসিক স্বাস্থ্য কোনো অনড় বা স্থির মানসিক অবস্থা নয়। ব্যক্তির পরিবেশ, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রক্রিয়ার উপর মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (খ) মনের সুস্থতা শুধুমাত্র কয়েকটি মানসিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক অবস্থা,জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তার মনোভাবের উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এগুলির মূল নির্ধারক অবশ্য ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। মানসিক স্বাস্থ্য বা তার সমস্যার প্রতিফলন ঘটে ব্যক্তির অভ্যাস ও আচরণে। (গ) মানসিক স্বাস্থ্য সমাজ নিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তি যে সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করে সেই সমাজের আচার, অনুষ্ঠান, রীতি - নীতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনাদর্শ সবকিছুই তার মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত। (ঘ) মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কেবলমাত্র কোনো পরিচিত বা স্বীকৃত মানসিক রোগের অনুপস্থিতি বোঝায় না। এগুলি স্বাভাবিক হলে ব্যক্তি সুস্থ অন্যথায় মানসিক স্বাস্থ্যে ঘাটতি আছে।

ব্যক্তির অভ্যাস আচরণ প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি ইত্যাদি তার মানসিক অবস্থার সূচক। যার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। (ঙ)মানসিক স্বাস্থ্যের কোনো সর্বজনীন আদর্শমান নির্দেশ করা যায় না।

যে ব্যক্তি মানসিক ব্যাধির শিকার তার ক্ষেত্রে রোগমুক্তি, অথবা যে ব্যক্তি উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন তার পক্ষে সেই উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা ও উন্নততর করার প্রয়াস নেওয়া মানসিক স্বাস্থ্যবিধানের লক্ষ্য। অতএব স্থিতিশীল মানসিক স্বাস্থ্যলাভ করা জীবনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ও বিলীয়মান দিগন্তের মত প্রগতিশীল লক্ষ্য বলা যেতে পারে।

সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য হল আমাদের সব জন্মগত ও অর্জিত কর্মসম্ভাবনাগুলির পারস্পরিক সঙ্গতি বিধান করে সমগ্র ব্যক্তিত্বের কাম্য বিকাশ ঘটিয়ে একটি লক্ষানুসারী সুসংহত প্রচেষ্টা চালনা করবার সক্ষমতা। মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের নিবিড় যোগাযোগ আছে তাই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ সমাজে ঘটবে এবং প্রাসঙ্গিক নয় বলে সামাজিক স্বাস্থ্যের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হল।

সুস্থ সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়াটি শৈশবেই শুরু হয়। শিশুর জীবনবিকাশে তার সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ, বুদ্ধি, সামর্থ্য, প্রবণতা ইত্যাদির সমন্বয় না ঘটালে তার মানসিক বিকাশ পূর্ণতা পায় না। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্যময় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, পরিণামে তার মনে নানা বিচ্যুতি ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আচরণে তার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলে আমরা সেই আচরণগুলিকে অসঙ্গতিমূলক আচরণ বলি। সূচনাতেই প্রতিকারের অসঙ্গতি গুরুতর রূপ ধারণ করে এবং মানসিক ব্যাধি রূপে দেখা দেয়। কয়েকটি অসঙ্গতিমূলক আচরণের উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

(১) **ভীরুতা (Timidity)** ঃ বিদ্যালয়ে অনেক সময় অতিরিক্ত চুপচাপ বা আপাত প্রতিক্রিয়াহীন ছেলে বা মেয়ে দেখা যায় যারা কোনো গোলমাল করে না বলে নজর এড়িয়ে যায় এবং ভাল ছেলে বা মেয়ে বলে গ্রাহ্য হয়। অতিরিক্ত গুটিয়ে থাকা কিন্তু তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব - এর লক্ষণও হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে এরকম আচরণ প্রায়শই দেখা যায়।

এইসব ছেলেমেয়েদের ভীরুতা দূরীকরণের জন্য যেমন আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা দরকার তেমন নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

(২) **ক্লাস পালানো (Truancy)** ঃ ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকবার ঘটনা বয়ঃসন্ধির ছেলে বা মেয়েদের কাছে বিরল নয়। বাড়িতে তিক্ত পরিবেশ, শিক্ষা সম্পর্কিত চাহিদার অতৃপ্তি, বয়সোচিত অন্য আকর্ষণ ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই দেখা যেতে পারে এমন প্রবণতা।

শ্রেণিকক্ষের এবং পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা, শিক্ষা পদ্ধতিকে শিক্ষার্থী - কেন্দ্রিক এবং ছাত্রছাত্রীকে অংশগ্রহণকারী করে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা পলায়নী মনোভাব দূরীকরণের সহায়ক হতে পারে।

(৩) **মিথ্যাভাষণ (Lying)** ঃ খেলার ছলে মিথ্যা বলা, বিষয়বস্তুকে অতিরঞ্জিত করে তোলা খুবই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু যদি বয়ঃসন্ধির ছেলে বা মেয়ে প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নেয় তখনই তার প্রতিকার করা অত্যন্ত জরুরী। গুরুজন সম্পর্কে ভীতি, নিজের ইচ্ছামত কাজে বাধা পাওয়া - ইত্যাদি এই ধরণের আচারণ উদ্রেক করতে পারে। ছেলে বা মেয়েটিকে অপরাধী গণ্য না করে এই প্রবণতা কেন তা খুঁজে বার করা দরকার ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(৩) **চুরি করা (Stealing) ঃ** কম বয়সে দেখা যায় আবার বয়ঃসন্ধিকালেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের পেন, বই, খাতা, শখের জিনিস না বলে নিয়ে নেবার অভ্যাস এক ধরনের অসঙ্গতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। মনের চাহিদার অপরিতৃপ্তি, কখনো বা মনোযোগ আকর্ষণ করা অথবা আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা পূরণের জন্য এমন কাজ ছেলে মেয়েরা করে থাকে বলে জানা গিয়েছে।

এইসব ছেলে মেয়েদের চাহিদার তৃপ্তি ঘটিয়ে তার প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী হয়ে এমন আচরণের মোকাবিলা করা যায়। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ছেলে বা মেয়েকে অন্যত্র যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিয়ে এমন আচরণ থেকে বিরত করা যায়। আলোচিত আচরণগুলি ছাড়া এমন আরো কিছু অসঙ্গতিমূলক আচরণ হল - আক্রমণাত্মক মনোভাব, অতিরিক্ত জিদ বা নেতি - মনোভাব, স্বার্থপরতা, খেয়ালী বা মেজাজী মনোভাব, ঈর্ষা পরায়ণতা ইত্যাদি। ছাত্র - ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহানুভূতিশীল আচরণ, বাবা মা এবং শিক্ষক- শিক্ষিকাদের যৌথ উদ্যোগ সূচনাতেই এই অসঙ্গতিগুলির প্রতিকার করতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে মৌলিক কতগুলি জীবনদক্ষতা ছাত্র-ছাত্রীদের অনুশীলন করানো যেতে পারে পরবর্তী পর্য্যায়ে তা আলোচনা করা হল।

- **জীবন দক্ষতার ধারণা ঃ** বয়ঃসন্ধির গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিতে ছেলেমেয়েদের শরীর যেমন বেড়ে ওঠে তেমনই তাদের মনন, চিন্তন, আবেগ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। দক্ষতা বিকাশ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা মানুষকে বিকশিত ও পরিণত হতে এবং নিজের সিদ্ধান্তে বিশ্বস্ত থাকতে সহায়তা করে। কিছু দক্ষতা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়, কিছু পরিবেশের মাধ্যমে এবং কিছু দক্ষতা শিক্ষণ, অনুশীলন ও অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে এই দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করার যোগ্যতাই হল দক্ষতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য বিভিন্ন রকম দক্ষতার কথা বলা হয়ে থাকে। তবে, একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে যে দক্ষতাসমূহ আশা করা যায় সেগুলিকে মোটামুটি দু'টি ভাগে দেখা যেতে পারে, ক) উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা— শারীরিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক ক্ষমতার সুসমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন করা অথবা সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করা। এই উৎপাদনের মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ করার মতো পণ্য বা পরিষেবা থাকবে তেমনি নান্দনিক মূল্য সম্পন্ন সৃষ্টিকেও গণ্য করতে হবে। (খ) সামাজিক ও চারিত্রিক দক্ষতা— চারিত্রিক গুণ ও চারিত্রিক দক্ষতার মধ্যে পার্থক্যটি বুঝে রাখা প্রয়োজন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আমাদের কোন মনোভাব ও আচরণ সমষ্টির স্বার্থের অনুকূল সেই উপলব্ধিকেই বলা যায় মূল্যবোধ — মূল্যবান আচরণ সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাস। সমাজ-স্বীকৃত এবং সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রীতি-নীতিগুলিকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে মানুষের চরিত্র নৈতিকতায় সমৃদ্ধ হতে পারে। মানুষের এই অন্তর্নিহিত গুণাবলী যখন তার আচরণে প্রতিফলিত হয় তখনই তা দক্ষতা বলে স্বীকৃতি পায়। 'কী করতে হবে' তার উপলব্ধি চরিত্রের গুণ। 'কি ভাবে করতে হবে' সেটা বুঝে নিয়ে কার্যক্ষেত্রে সেই গুণকে প্রয়োগ করাই দক্ষতা। সততা, মানবপ্রেম, সংস্কারমুক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি অনেক মানবিক গুণ সম্পর্কে আমরা অবহিত। এসবের মূল্য

সম্পর্কেও আমাদের দ্বিধা নেই। তথাপি অনেক সময় বাস্তবে আমাদের আচরণ এই বিশ্বাসের অনুগামী হয় না, দক্ষতায় ঘাটতি পড়ে। সুতরাং জ্ঞান ও বোধের সঙ্গো দক্ষতা অর্জনও অনুশীলনের বিষয়।

জীবনশৈলী শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রে কয়েকটি বিশেষ আচরণগত গুণ সঞ্চারিত করা যার সমন্বয়ে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য সুস্থ ও পূর্ণ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে। এই গুণগুলিকেই জীবনদক্ষতা বা জীবনকুশলতা নাম দেওয়া হয়েছে। মানুষের চরিত্রের এই সম্পদগুলিকে কর্মকুশলতা বা কাজের দক্ষতা থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালের অস্থির মানসিক অবস্থার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা নিহিত থাকে তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারলেই এই সমাজ-সার্থক চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব। যে দক্ষতাগুলির কথা এই প্রসঙ্গো সাধারণত আলোচিত হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত ধারণা নীচে দেওয়া হল ঃ

১। **আত্মউপলব্ধি ঃ** বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজেকে নিয়ে কিছু সংশয়, প্রশ্ন ও কামনা-বাসনা জেগে উঠে। আমি কে, আমি কি পেতে চাই, কি হতে চাই, তার জন্য কি করতে চাই, কোন কাজটা আমি পারি, কোথায় আমার দুর্বলতা— এমন ধরনের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবার কৌশল যদি তারা আয়ত্ত করতে পারে তাহলে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে কিছুটা ভারমুক্ত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তারা জীবনপথে এগিয়ে চলতে পারে। তবে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজের সার্বিক অবস্থা তার প্রধান অন্তরায়।

২। **আত্মমর্যাদাবোধ ঃ** নিজেকে জানার সঙ্গো সঙ্গোই শিক্ষার্থীদের নিজের সম্পর্কে একটি বাস্তবোচিত মূল্যায়ন করতে শেখা দরকার যা তাকে সমাজে সংসারে নিজের স্থান বুঝে নিতে সাহায্য করবে। একদিকে অহমিকা, অন্যদিকে হীন্যমন্যতা— এই দুই চরম মনোভাব পরিহার করে তারা নিজেদের মর্যাদা বুঝে নেবে। সেটা পারলে তারা নিজেদের আচরণকে সেই মর্যাদার উপযুক্ত করে তুলতে পারবে। অন্যায় প্রলোভন বা কু-প্রবৃত্তির বশে নিজেকে অন্যের চোখে হেয় হতে দেব না এই অঙ্গীকার তাদের ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

৩। **আত্মপ্রকাশ ঃ** অনেক আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-কৌতূহল, বিস্ময়-জিজ্ঞাসা এই সব নিয়ে বয়ঃসন্ধি এগিয়ে চলে। কবি সুকান্তর অনন্য বর্ণনায় 'বাষ্পের বেগে স্টীমারের মত চলে।' মন খুলে এসব কথা বলা, সুখের অনুভূতি বা অব্যক্ত যন্ত্রণা অন্যদের সঙ্গো ভাগ করে নেবার ইচ্ছে তাদের উদ্বেল করে তোলে। কিছুটা প্রসঙ্গাচ্যুত হলেও রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি কলি বোধহয় এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ'

বা

'আমার ইচ্ছে করে তোদের মত মনের কথা কই'

আমার কথা কে শুনবে, কে আমাকে বুঝবে? এই প্রশ্ন তাদের পীড়িত করে।

তাই মনের কথাগুলি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এক মূল্যবান কুশলতা। এই দক্ষতা ছেলেমেয়েদের মনের ভার লাঘব করবে, তদুপরি তাদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

নিজের মনকে উন্মোচিত করার প্রক্রিয়া অবশ্যই একমুখী হবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী তা দ্বিমুখী বা বহুমুখী হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি নিজের আবেগ-অনুভূতি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইবে তাকে অবশ্যই শ্রোতার প্রতিক্রিয়া জানতে এবং বুঝতে হবে। আবার অন্য কেউ যখন মনের কথা বলতে চাইবে তখন সেই কথা শোনার, অনুধাবন এবং সুস্থ প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের মানসিকতাও অর্জন করতে হবে। জানানো এবং জানার এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে একটি বোঝাপড়ার সেতু নির্মিত হতে পারে। তখন আত্মপ্রকাশের দক্ষতা এক নতুন মাত্রা পেয়ে 'সংযোগ'-এর দক্ষতায় পূর্ণতা লাভ করে। এই সংযোগ দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন হতে পারে, আবার অনেকের সঙ্গে আলোচনার রূপ নিতে পারে। দু'জন বা অনেক মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনৈক্য থাকতে পারে। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে সেই পার্থক্য দূর করা, সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয়। মতান্তর মনান্তরে পর্যবসিত হয় না। এর ফলে তরুণ-তরুণীদের চিন্তা-ভাবনা পরিশীলিত হবে, সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ়তর হবে। সংযোগ দক্ষতা ব্যক্তির যথার্থ সামাজিকীকরণের একটি আবশ্যিক উপাদান।

এখানে একটি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করা প্রয়োজন। উপরে লেখা তিনটি দক্ষতাই নিজেকে কেন্দ্র করে। ধারণার অস্বচ্ছতা থাকলে এগুলি আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিতে পারে যা বর্তমান প্রতিযোগিতা-জর্জর সমাজে বড় ব্যাধি। এই তিনটির অনুশীলনই সমাজ-সংসারের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে স্থাপন করা দরকার। একজন সুনাগরিক তার নিজের আশা ও নিজের চাহিদাকে যেমন বুঝবে, তার কাছে সমাজের কি প্রত্যাশা সে সম্পর্কেও অবহিত ও সজাগ থাকবে। নিজের অধিকার এবং মর্যাদাবোধ যেমন গড়ে তুলতে হবে তেমনই তা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

৪। **সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সমস্যার সমাধান ঃ** শৈশব থেকে সব মানুষই পদে পদে নানা বিষয়ে নিজের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। একটি কিশোর বা কিশোরীর তার স্কুলে যাওয়া, খেলার মাঠে অংশগ্রহণ করা, বাড়ির কাজ করা, গুরুজনদের মান্য করা, সকলকে লুকিয়ে কিছু করে ফেলা এমন সব কাজের ক্ষেত্রেই সবসময় কিছু স্থির করছে। যেভাবেই হোক, সে তার বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার সমস্যার সমাধান করে চলেছে। প্রতিক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিবেচনা শক্তির উপর মূলতঃ নির্ভর করে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে যার প্রধান ধাপগুলি হল—

ক) **সমস্যাটিকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়া ঃ** অনেক সময় আমরা দু-একটি লক্ষণকেই সমস্যা বলে ধরে নিই। মূল সমস্যাটিকে বুঝতে পারি না। এমন হলে উপযুক্ত সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং লক্ষণ বা উপসর্গগুলির গভীরে গিয়ে সমস্যাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রথম পদক্ষেপ।

খ) **সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ঃ** সমস্যাটিকে চিহ্নিত করার পরে তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা দরকার। সমস্যার উৎপত্তি, তার মুখ্য ও গৌণ কারণসমূহ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম প্রভৃতি দিক থেকে বিচার করলে তার স্বরূপটি উন্মোচিত হবে।

গ) **বিকল্প সমাধানসমূহ অনুসন্ধান ঃ** প্রায় সব সমস্যার একাধিক সমাধানের পথ থাকে। সাধারণত মানুষ বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে হাতের কাছে যে সহজ সমাধানটি দেখা যাচ্ছে সেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে সবচেয়ে ভালো সমাধানটি পাওয়া যায় না। সুতরাং সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী যতগুলি সমাধানের পথ থাকতে পারে তার সবগুলিকে খুঁজে নেওয়া দরকার।

ঘ) **বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ঃ** যে বিকল্প সমাধানগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে তার সবকটিকে বাঞ্ছনীয়তা ও সম্ভাব্যতার নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে।

ঙ) **শ্রেষ্ঠ বিকল্পটি বেছে নেওয়া ঃ** এই প্রক্রিয়ায় পাওয়া তুলনামূলক চিত্র থেকে সবচেয়ে কাম্য পথটিকে বেছে নিতে পারলে সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতিটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

একথা ঠিক যে অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেবার সময় ওই কেতাবি পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু পদ্ধতিটির সঙ্গে পরিচয় থাকলে এবং সচেতনভাবে প্রয়োগ করলে এটি চিন্তন অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে যায়। তখন সচেতনভাবে না হলেও অধিকাংশক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ হবে।

বয়ঃসন্ধির সময় এই দক্ষতাটির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সব বয়সের মানুষই প্রায় সারা জীবন ধরে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে। কোনো সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, কোনোটা হয়ত ভুল হয়, তবে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত হয় আংশিকভাবে ঠিক, অংশত ভুল। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বয়ঃসন্ধির শিক্ষায় আলাদা করে এই বিশেষ দক্ষতার উল্লেখ করা হচ্ছে কেন। এই দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা দু-দিক থেকে বিচার করা যায়। প্রথমত এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিছু সমস্যাকে তারা একান্তভাবে ব্যক্তিগত মনে করে। ছোটদের মতো সব কথা বাবা মা- কে বলতে তাদের দ্বিধা হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজের সমস্যা নিজেই মেটাবার তাগিদ তারা অনুভব করে। অপরদিকে এই বয়সেই ছেলেমেয়েদের যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে বুঝে নেবার ক্ষমতাও বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রয়োজন ও যোগ্যতার সংযোগ ঘটে। তাই সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতা তাদের ব্যক্তিত্বের পরিণমনে সহায়তা করে।

৫। **মত প্রকাশের দৃঢ়তা ঃ** অনেক সময় ছেলেমেয়েরা কর্তব্য অ-কর্তব্য স্থির করতে পারে, কিন্তু নিজের মত নির্দ্ধিধায় জোরালোভাবে বলতে পারে না। একটি কিশোর তার বন্ধুকে ধূমপান বা অন্য কোনো অবাঞ্ছিত কাজে প্ররোচিত করতে চাইছে। প্রথমেই নিজের আপত্তি প্রকাশ করলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই বন্ধুর অনুরোধে, বন্ধুর প্রতি দুর্বলতার জন্য অথবা সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকতে পারে না। ফলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপথে চলার সূত্রপাত হয়।

সুতরাং অকারণ রূঢ়তা এড়িয়ে নিজের মত স্পষ্ট করে জানানো এবং সেই অবস্থানে অবিচল থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন।

এ ব্যাপারেও একটু সতর্কতা আবশ্যক। যে নিজের আপত্তি জোর দিয়ে বলতে শিখবে সে তো নিজের অন্যায় চাহিদাতেও সমানভাবে অনড় থাকতে চাইবে। সুতরাং এই দক্ষতাটি প্রয়োগের পূর্ব শর্ত হচ্ছে উচিত-অনুচিত, কাম্য-অকাম্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা।

৬। **আবেগ নিয়ন্ত্রণ** ঃ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজজীবনে আবেগ একটি মূল্যবান সম্পদ। মানুষের প্রতি ভালবাসা, অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সহযোগী মনোভাব নিয়ে সুস্থ সমষ্টিবন্ধ জীবনযাপন করার ভিত্তিই হচ্ছে পবিত্র আবেগ। আবেগশূন্য হলে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হবে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত আবেগের প্রাবল্য কখনো কখনো মানুষের বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন মানুষ জীবনযাত্রায় সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, পথভ্রষ্ট হয়। তাই আবেগকে সঙ্গত মাত্রার মধ্যে নিবন্ধ রাখার দক্ষতা অত্যন্ত মূল্যবান।

৭। **চাপ সহ্য করা** ঃ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মনে স্বাভাবিকভাবেই নানারকম চাপ সৃষ্টি হয়। অনেক রঙিন স্বপ্ন তারা দেখে, কিন্তু নির্মম বাস্তবের আঘাতে তার অধিকাংশই ভেঙে যায়। জীবনের অনেক আশা পূরণ হয় না। দৈনন্দিন জীবনে ছোট-বড় নানা ব্যর্থতা তাদের অন্তরকে পীড়িত করে। বর্তমান যুগের জটিল আর্থসামাজিক পরিস্থিতি আগামী দিনের নাগরিকদের এক বিরাট অংশের কাছে ক্রমশ বেশিমাত্রায় প্রতিকূল হয়ে উঠছে। জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সাধারণ সুযোগগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা অসহায় বোধ করছে। সমাজে সংসারে নিজেদের মূল্যহীন মনে করছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু তরুণ-তরুণী প্রাচুর্যের সমুদ্রে ভাসছে। শুধু জীবনধারণ নয়, ভোগবিলাসের সব উপকরণ তাদের হাতের মুঠোয়। আত্মমগ্ন এই শ্রেণির কাছে সমাজের স্বার্থ নগণ্য। এই বৈষম্য দেখে বঞ্চিতের দল সমাজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না। তরুণ মনে এই অস্বাভাবিক চাপ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে।

এই আরোপিত চাপের যথাযথ মোকাবিলা করতে না পারলে তরুণ- তরুণীরা বিপথে চলে যায়। ভেঙে পড়া মন নিয়ে তারা অবসাদ বা বিষণ্ণতায় ভোগে। আত্মহননকারী বিবিধ প্রবণতা তাদের গ্রাস করে। মাদকাসক্তি, যৌন অনাচার, হিংস্র প্রতিবাদ প্রভৃতি সেই দুর্বলতার পরিণাম। সুতরাং বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের পরিস্থিতির প্রতিকূলতা অনুধাবন করতে হবে, তার কারণগুলি যুক্তিবাদী মন দিয়ে বুঝতে হবে এবং সমষ্টিগতভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে পালিয়ে না যাবার মতো মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। পক্ষান্তরে বিত্তবান পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত তরুণ-তরুণীদেরও অনুভব করতে হবে 'স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।' সেই ছেলেমেয়েরাও অন্যরকম চাপের মধ্যে থাকে— তাদের আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী, কোনো বৈভবই তাদের সীমাহীন চাহিদাকে তৃপ্ত করতে পারে না। তাই তাদের হতাশাও হয় অতলস্পর্শী।

সব মহলের নাগরিকদের নিয়েই আমাদের সমাজ, সব শ্রেণির ছেলেমেয়েরাই আমাদের লক্ষ্যদল। চাপের মুখে অবিচল থাকার দক্ষতা তাদের অর্জন করতেই হবে। এই দক্ষতা তারা আয়ত্ত করবে জীবন থেকে, যে জীবন গড়ার একটি স্তম্ভ শিক্ষাব্যবস্থা। তারা শিখবে, কবির ভাষায় - *'ভালমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।'*

৮। **সহমর্মিতা** ঃ এটি মূলত শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি বিমূর্ত ধারণা। সাধারণভাবে এর অর্থ হচ্ছে নিজের আবেগ-অনুভূতিকে অন্য কোনো ব্যক্তির সমস্তরে নিয়ে এসে তদনুযায়ী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। একজন মানুষ রেগে গেলে অন্যজন তাকে ব্যঙ্গ করে, ভেঙিয়ে আরো রাগিয়ে দিতে পারেন অথবা নিজেকে সেই ব্যক্তির জায়গায় প্রতিস্থাপন করে তার ক্ষোভের কারণ বুঝে নিয়ে তার প্রতি ইতিবাচক আচরণ করতে পারেন। এই আচরণ অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কিন্তু সচেতনভাবে অভ্যাস করলে এই প্রতিক্রিয়াকে সর্বদাই সদর্থক করে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে কেউ দুঃখ প্রকাশ করলে নির্বিকার থাকা অথবা তাকে বিদ্রূপ করার বদলে তার দুঃখের সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে দেওয়াটা স্বভাবের অঙ্গ হয়ে উঠবে। এই দক্ষতা ছেলেমেয়েদের সামাজিকীকরণের পথে এগিয়ে দেয়। মানুয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৯। **সহিষ্ণুতা** ঃ সব মানুষের ক্ষেত্রেই সহিষ্ণুতা একটি মৌলিক চারিত্রিক গুণ। কিন্তু বয়ঃসন্ধির জীবনকুশলতা হিসেবে এটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মসচেতনতার ফলে অসহিষ্ণুতার ঝোঁক দেখা যায়। তারা যখন আত্মমর্যাদা এবং মতামতের দৃঢ়তার দিকে দৃষ্টি দেবে তখন ছোট-বড় কারো কথাই মেনে না নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতাও বাড়বে। এই ঝোঁক এড়াতে না পারলে সামাজিক সুসম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তারা সমস্যায় পড়বে।

● **জীবনশৈলী নামের তাৎপর্য** ঃ বয়ঃসন্ধির শিক্ষা প্রসঙ্গে সাধারণত 'জীবন দক্ষতা' বা 'জীবন কুশলতা' নামটিই ব্যবহার করা হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে 'জীবন শৈলী' নামকরণে অভিনবত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিধা যুক্তিসঙ্গত। সারা দেশের কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্নরকম আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে। তাই জীবনকুশলতাগুলি আয়ত্ত করার সুযোগ সকলে সমানভাবে পায় না। স্বভাবতই এই দক্ষতাগুলি অধিগত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য থাকবে। কেউ হয়ত দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশে পটু হয়ে উঠল, কিন্তু তার সহমর্মিতায় ঘাটতি থেকে গেল। কারো বা আত্মমর্যাদা প্রখর হল, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে দুবর্লতা রয়ে গেল। এইভাবে বিভিন্ন মাত্রায় জীবনকুশলতাগুলি আত্মস্থ করে ব্যক্তির জীবনচর্যার অভিমুখ গড়ে ওঠে। জীবনকুশলতার সমন্বয়ে নির্মিত হয়ে জীবন-শৈলী। শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হবে সকলের মধ্যে জীবনকুশলতাগুলি কাম্যস্তরে বিকশিত করা— যা আদর্শস্থানীয় জীবন-শৈলী রচনা করবে। কিন্তু বাস্তবে অনিবার্যভাবেই নানা মানুষের জীবন-শৈলীর মধ্যে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকবে। আয়ত্ত করতে হবে কুশলতা, তার নির্যাস হিসেবে ফল পাওয়া যাবে জীবনশৈলীতে।

● **জীবনশৈলী শিক্ষার কার্যক্রম** ঃ মাধ্যমিক স্তরে পাঠপরিকল্পনার সঙ্গো যুক্ত মহল মনে করেন, বর্তমানে অনুসৃত পাঠক্রমকে আর ভারাক্রান্ত করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সুতরাং নতুন কোনো বিষয় সংযোজন না করা পর্ষদের বিবেচিত নীতি। আগের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনশৈলী শিক্ষার বড় অংশই মূল্যবোধ ও চরিত্রগঠনকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হবে। জাতীয় স্তরে সহমতের ভিত্তিতে স্থির হয়েছে যে যাবতীয় কাম্য মূল্যবোধ সঞ্চারের জন্য প্রচলিত পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকেই যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে। জীবনশৈলীর ক্ষেত্রে শুধু শারীরবৃত্তের কিছু অংশ জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে যোগ করা হবে। অবশিষ্ট বড় অংশই নানাবিধ সুপরিকল্পিত সহপাঠক্রমিক কৃত্যের ভেতর দিয়ে সম্পন্ন করার চেষ্টা হবে। সবরকম পরিস্থিতিতে একই কার্যক্রম অনুসরণ করা বা ফলপ্রসূ করা যাবে না। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন ও সম্ভাব্যতা বিচার করে উপযুক্ত কার্যক্রম উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

একথা পুনরুল্লেখের দাবি রাখে যে জীবনকুশলতার অনুশীলন সকল শিক্ষার্থীকে সমমানের জীবনশৈলীতে উন্নীত করে না। বিত্তবান, অভিজাত এবং আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের সন্তানদের সুযোগ-সুবিধা, স্বপ্ন ও সমস্যা এক রকম ; আবার দরিদ্র পিছিয়ে-পড়া ঘরের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণই ভিন্ন। ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং কন্যা সন্তান-এর প্রতি বঞ্চনার অভ্যাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। তাই আত্মমর্যাদা প্রভৃতি দক্ষতা অর্জন করা ছাত্রীদের পক্ষে অনেক কঠিন কাজ। সব শ্রেণির ছেলেদের ও মেয়েদের সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ক্ষেত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং দুর্বল অংশের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

● **দক্ষতা গড়ে তোলার পদ্ধতি** ঃ এর আগে 'দক্ষতা সমূহ ও তাদের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক বিভাগে নয়টি বিশেষ জীবনদক্ষতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই দক্ষতাগুলি গড়ে তোলার জন্য কিছু অংশে প্রত্যক্ষভাবে পাঠক্রমের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু বেশির ভাগ দক্ষতাই সাধারণ, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গো জড়িত। বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমেই মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকে। শিক্ষামহলে একথা স্বীকৃত যে সব বিষয়ই মূল্যবোধের বিষয় এবং সব শিক্ষকই মূল্যবোধের শিক্ষক। নানা কারণে পাঠক্রমের মাধ্যমে মূল্যবোধ সঞ্চারের এই লক্ষ্য যথাযথ ভাবে অর্জন করা যায় না। সুতরাং, পরিপূরক আয়োজন হিসেবে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধির ছাত্র-ছাত্রীদের চারিত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সমস্যাগুলি দেখা দেয় সার্থক ভাবে সেগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট জীবনকুশলতা চিহ্নিত করা হয় যার আলোচনা আগেই দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই এই দক্ষতাগুলো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের কিছু ভূমিকা আছে। যেমন, যুক্তিসম্মত চিন্তার ক্ষমতা তৈরি করার জন্য গণিত একটি অত্যন্ত উপযুক্ত বিষয়। তবে, মূল্যবোধ সঞ্চারের সবচেয়ে কার্যকরী সম্ভাবনা আছে সাহিত্যের মধ্যে।

শারীরবৃত্তীয় অংশে যা বলা হয়েছে তা মূলত তথ্য ও ব্যাখ্যা নির্ভর। এই অংশটি অনেকটাই প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠক্রম-কেন্দ্রিক হবে। এখানে জ্ঞান ও বোধ-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পাঠক্রমে মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র (যথা, শ্বসনতন্ত্র, পৌষ্টিকতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র ইত্যাদি) পড়াবার ব্যবস্থা আছে। প্রজননতন্ত্র

ব্যবস্থায় শারীরবৃত্তীয় আলোচনায় প্রয়োজনীয় অংশের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ব্যাখ্যা জীবনবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্য শিক্ষার অনেক বিষয়ই জীবন-শৈলীর ক্ষেত্রেও এসে যায়। আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা পাঠক্রমে দেওয়া আছে তা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন প্রয়োজন মনে হলে সেই মর্মে পাঠ্যসূচির পরিমার্জন করা হবে।

পাঠ্যবিষয়ে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য পাঠ্যবিষয়ে সম্ভাব্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। বয়ঃসন্ধির শিক্ষার্থীদের বিশেষ পরিস্থিতির নিরিখে সুপরিকল্পিত সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্বও উপলব্ধি করতে হবে। প্রয়োজনীয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে থাকতে পারে প্রশ্ন বাক্স, দৃশ্যায়ন/ ভূমিকা অভিনয়, দলগত আলোচনা. বিতর্ক, কেস স্টাডি, অংকন/ পোস্টার প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এটা মনে রাখা ভালো, এই কার্যাবলীর বিষয়গুলিকে একান্ত ভাবেই যৌন সংক্রান্ত প্রসঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। ব্যাপক অর্থে সমাজের সমসাময়িক সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত রাখা, তাদের চেতনার মান উন্নত করা ও সুস্থ চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, বিতর্কের বিষয় হিসেবে মানবাধিকার, নারীর মর্যাদা, বাজার নিয়ন্ত্রিত সমাজ, নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণ ইত্যাদি রাখা যায়। পোস্টার আঁকার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পণপ্রথার কুফল, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি তুলে ধরা যায়। এর ভেতর থেকে স্থানীয় পরিস্থিতির উপযুক্ত কার্যক্রম বেছে নেওয়া অথবা নতুন কিছু যুক্ত করার জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরিকল্পনা করবেন এবং তাদের নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করবেন।

বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সব রকম আয়োজন করা বিদ্যালয়ের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার কমিশন) শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয়ের বাইরে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ব্রতী সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়কে যুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটিও (২০০১-২০০২) এই সুপারিশ উদ্ধৃত করে এই রাজ্যের কয়েকটি সংগঠনের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাদের অনুসৃত কর্মসূচি এবং সংশাপত্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছেন। মণিমেলা, সব পেয়েছির আসর, ব্রতচারী সমিতি, স্কাউটস্-এন্ড-গাইডস্, কিশোর বাহিনী, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ প্রভৃতিকে স্বীকৃতি দিলে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয়ের দুর্বলতা অনেকাংশে দূর করা যাবে। এই সংগঠনগুলির আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চমানের শৃঙ্খলা এবং সমাজ চেতনার অনুশীলন দেখা যায়। সকলের সঙ্গে মিশে সমষ্টিগত জীবন যাপনের মূল্যবান শিক্ষাও কিশোর-কিশোরীরা এই শিবিরগুলি থেকে আহরণ করে।

● সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি ঃ

বড় হবার সঙ্গো সঙ্গো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখা দেয় কত না কৌতূহল, অজানা রহস্য সমাধানের ইচ্ছা। মনের মধ্যে জমে থাকা সেইসব প্রশ্ন কার কাছে করলে সঠিক পথনির্দেশ পাবে তা এই বয়সের ছাত্রছাত্রীরা বুঝে উঠতে পারে না। এই সময়ে স্কুলগুলিতে, যেখানে তারা বিভিন্ন বিষয়ে শেখার, জানার প্রস্তুতি নেয়, সেখানে সহপাঠক্রমিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের এই বিভিন্ন বিষয়ে ডানামেলা জিজ্ঞাসাগুলির সদুত্তর দেওয়া যেতে পারে। নিচে এমনই কিছু সহপাঠক্রমিক কাজের বর্ণনা দেওয়া হল।

● ক. প্রশ্নবাক্স ●

প্রশ্নবাক্সকে সঠিক অর্থে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম না বলে একটি সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা সমীচীন। প্রশ্নবাক্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তিরা দেবেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটির প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তাই শরীর-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির জন্য স্বতন্ত্র বাক্স রাখা ভাল। বাক্সটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নিঃসংকোচে তাদের প্রশ্নগুলি জমা দিতে পারবে, যেমন, অফিস অথবা প্রধান শিক্ষকের ঘরের বাইরে। প্রশ্নগুলি করার সময়ে নিজের নাম না লিখলেও কয়েকটি তথ্য জানালে ভাল হয়। যেমন, ক) প্রশ্নকারী শিক্ষার্থী ছাত্র না ছাত্রী খ) তার বয়স কত গ) সে কোন শ্রেণির ছাত্র বা ছাত্রী ঘ) তার বাড়িতে কে কে আছেন ঙ) তার প্রিয় শখ ও আগ্রহের বিষয়গুলি কি কি ইত্যাদি। প্রশ্নগুলিকে গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক উত্তর না দিয়ে কয়েকদিন প্রস্তুতির সময় নেওয়া দরকার। অনেকক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া পরামর্শদান -এর প্রয়োজন মেটাতে পারে। মন খুলে প্রশ্ন করার এবং নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে, তাদের ভয় দূর করতে হবে। এটা অনেকটা নির্ভর করবে উত্তর দেবার সদর্থক বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভঙ্গির উপর।

প্রশ্নবাক্সে আসতে পারে এমন কয়েকটি সম্ভাব্য প্রসঙ্গোর নমুনা নিচে দেওয়া হল—

১) পড়াশোনার চাপ-সংক্রান্ত

২) পড়াশোনায় মন রাখবার উপায়-সংক্রান্ত

৩) পাঠ্যবিষয় মনে রাখবার উপায়-সংক্রান্ত

৪) বন্ধুদের আচরণ সংক্রান্ত

৫) অভিভাবক ও নিকটাত্মীয়দের ব্যবহার সংক্রান্ত

৬) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণ সংক্রান্ত

৭) ভাই ও বোনের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত

৮) বিপরীত লিঙ্গোর প্রতি আচরণ সংক্রান্ত

৯) শরীরের বিকাশের অজানা বিষয় সংক্রান্ত

১০) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

১১) বয়ঃসন্ধিকালীন বিশেষ শরীর ও মানসিক সমস্যা সংক্রান্ত

● খ. প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ●

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা একটি আকর্ষণীয় সহপাঠক্রমিক কর্মসূচি হতে পারে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পড়াশোনা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বাইরের বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জেগে উঠতে পারে। শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা বিবিধ প্রসঙ্গো তথ্য আহরণ করে প্রস্তুতি নিতে পারে। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন অংশকে উন্মোচন করার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। অথবা বিষয়ভিত্তিক না রেখে দলগতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নের সংকলন করে দলগত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা (প্রতিটি দলে কমপক্ষে পাঁচ জন থাকা বাঞ্ছনীয়) আয়োজন করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের কৌতূহল নিবৃত্তি করার এবং নতুন প্রশ্নের অবতারণা করার সুযোগ মেলে। কেবল শিক্ষার্থী এবং অংশগ্রহণকারীরাই নয়, উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা সকলেই এই সহপাঠক্রমিক কর্মসূচিতে উৎসাহিত বোধ করেন এবং আন্তরিকভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে একাত্ম হয়ে পড়েন।

নিচে কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল ঃ

১। কোন ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়?
২। টি. বি. রোগ কি ছোঁয়াচে?
৩। সাহিত্যে ভারতে কে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান?
৪। সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল মাত্রাগুলি কি কি?
৫। ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যান কোন রোগে?
৬। ভারতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কত?
৭। এইডস রোগ কি ছোঁয়াচে?
৮। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু খাওয়া কি ক্ষতিকর?
৯। গ্রহণের আগে রান্না করা খাবার গ্রহণের পরে খাওয়া কি ক্ষতিকর?
১০। কু-সংস্কার বলতে কি বোঝ?
১১। স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ অর্থ কি?
১২। বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ?
১৩। বিশ্বায়ন পরিবেশকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
১৪। খাবার জিনিস রাখার জন্য যে রেফ্রিজারেটর ব্যবহার হয়, তা কি পরিবেশ দূষণের কারণ?
১৫। গ্রিনহাউস এফেক্ট কি?
১৬। বিশ্বের মানবোন্নয়ন তালিকায় ভারতের স্থান কত নম্বরে?
১৭। তোমার মতে বেকারত্বের কারণ কি।
১৮। কর্মরত মানুষকে কাজ হারাতে হচ্ছে কেন?
১৯। হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত— এই চরিত্র দুটি কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টি? এদের পেশা কি?
২০। বল তো এই পংক্তিগুলি কার লেখা?

ক) 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'
খ) 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'
গ) 'মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সকল'
ঘ) 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল'
ঙ) 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি'

● গ. দলগত আলোচনা ●

দলগত আলোচনা কর্মসূচি একটি অত্যন্ত কার্যকর বিষয়। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে। তাই বয়ঃসন্ধিকালীন শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনায় উন্নত চিন্তাভাবনার বিকাশে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার পরিসর খুব বেশি না হওয়াই ভাল এবং বিষয়গুলি উপযুক্ত শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

দলগত আলোচনার বিষয় হতে পারে এমন কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

১। পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি।
২। তোমার এলাকায় জনস্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার।
৩। আমাদের পরিবেশ, আমরা কী করছি।
৪। সর্বশিক্ষা অভিযান ও আমরা।
৫। বয়ঃসন্ধিকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা ও প্রতিকার।
৬। বর্তমান সমাজ ও মূল্যবোধ।
৭। দূরদর্শন ও যুবসমাজ।
৮। আঠারো বছর বয়স-এর চোখে আজকে-র সমাজ।
৯। বিদ্যালয়স্তরে সহশিক্ষা ও অভিভাবকগণ।

● ঘ. বিতর্ক ●

বিতর্ক একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে কোনো বিতর্কিত বিষয় পর্যালোচনা করা যায়। বিতর্কে যে কোনো বিষয়ের ভাল-মন্দ উভয় দিকই উপস্থাপিত হয়— এটি একজন মানুষকে ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত এবং জটিল চিন্তার খোরাক জোগায়— একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয় এবং চিন্তন ও বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

নিচে কয়েকটি বিতর্কের বিষয়ের উদাহরণ দেওয়া হল।

১। বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ের ভূমিকা।
২। আজকের সমাজ মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মনে করে।
৩। যৌথ পরিবার ফিরিয়ে আনা দরকার।
৪। পণপ্রথা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি রূপ।

৫। সাম্প্রদায়িকতা সমাজ উন্নয়নের বড় বাধা।
৬। শোষণহীন সমাজ ছাড়া নারীর মুক্তি সম্ভব নয়।
৭। আর্থসামাজিক বৈষম্য সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়।
৮। পিতামাতার উচ্চাশা বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের জীবনে বিড়ম্বনা ডেকে আনে।
৯। পরীক্ষায় নম্বরের প্রতিযোগিতা প্রকৃত শিক্ষাকে বিঘ্নিত করে।
১০। জনশিক্ষার স্থান জনস্বাস্থ্যের আগে।

● ঙ. দৃশ্যায়ন ●

দৃশ্যায়ন হল এক ধরনের সংক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া যা বাস্তব জীবনের সম্ভাব্য অবস্থাগুলিকে বর্ণনা করে। দৃশ্যায়নে অংশগ্রহণকারীরা অপরের চরিত্রকে অনুসরণ করে। অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং ঘটনার সাথে যুক্ত চরিত্রগুলিকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করার আগেই সেগুলিকে অনুশীলনের সুযোগ করে দেয়। দৃশ্যায়ন ছাত্রদের সেই সব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ এনে দেয় যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার দক্ষতাগুলি প্রয়োগ করা যায়। এ ধরনের সক্রিয়তা ভিত্তিক কাজকর্ম জীবনের সবক্ষেত্রেই বিশেষত, বয়ঃসন্ধিকালীন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী।

নমুনা (১) ঃ ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়েছে, বর্তমানে তারা দুই ভিন্ন স্কুলের (হয়তো বা ভিন্ন জায়গারও) অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। বেশ কয়েক বছর পর আচমকাই পড়তে যাওয়ার পথে রাস্তায় দেখা। দু'জনেরই ধূমপানের অভিজ্ঞতা হয়েছে, উভয়ের কথোপকথনে যা বেরিয়ে এল, তাই-ই তুলে ধরা হল

কমল ঃ আরে, রবি না? অনেকদিন পর, কেমন আছিস?

রবি ঃ ভালোই আছি, তোর কী খবর?

কমল ঃ এই চলছে, তা এই সময় এ দিকে?

রবি ঃ (বই-এর ব্যাগ দেখিয়ে) পড়তে যাচ্ছি, তুই-ও বুঝি ...

কমল ঃ হ্যাঁ, আজ দেরী হয়ে গেল, কতক্ষণ ধরে ফালতু দাঁড়িয়ে রয়েছি, বাস আসছে না (বলতে বলতে পকেটে রাখা নামী ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেটটি থেকে নিজে একটা নিল, আর বন্ধুকেও এগিয়ে দিল)।

রবি ঃ না রে, ছেড়ে দিয়েছি।

কমল ঃ হঠাৎ? কেউ নিশ্চয়ই জ্ঞান দিয়েছে? আরে ও সব ছাড়্। কিস্‌সু হয় না। নে ধর্ (এই বলে আবার সিগারেট-টা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিল, কিন্তু রবি তাতেও প্রলুব্ধ হল না)।

রবি ঃ এরকম করিস না। সে তো আমার বাবাকেও দেখেছি আগে অত সিগারেট খেতেন, এখনও তো দিব্যি আছেন। যদিও নিজে থেকেই এখন ছেড়ে দিয়েছেন।

কমল ঃ সে কি রে! কাকু এখন আর সিগারেট খান না? কেন? কী হল?

রবি ঃ আর বলিস্ না একটা ঘটনাই আমাদের সবার চোখ খুলে দিল রে।

কমল ঃ বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, তা কেস্ টা কি ? শুনি।

রবি ঃ তোর আমাদের স্কুলের নিতাই বাবুকে মনে আছে ?

কমল ঃ হ্যাঁ আলবাৎ মনে আছে। তোদের পাড়াতেই তো থাকতেন, তো এখন স্যার, কেমন আছেন ?

রবি ঃ আর কেমন আছেন, জানিস-ই তো, স্যার, কী রকম ঘন ঘন সিগারেট খেতেন, চেহারাটা তো ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বললেও শুনতেন না, শেষ পর্যন্ত ফুসফুসের ক্যানসারে মারা গেলেন, চোখের সামনে মানুষটাকে শেষ হয়ে যেতে দেখলাম।

কমল ঃ (সিগারেটটি মুখে, হাতে ম্যাচ বাক্স, কাঠিটা বের করে আগুন জ্বালালো কিন্তু সিগারেট-এর গোড়ায় ঠিকমত সংযোগ করাতে পারল না । কাঠিটা ফেলে দিল। এক অদ্ভুত দোলাচল তার মনের মধ্যে তৈরি হতে লাগল, সে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল এক চরম ঘৃণায়। নিজের ওপর নিজেরই রাগ হল, কারণ এই সিগারেটের জন্যই পয়সা চুরি করেছে, বাবা-মাকে মিথ্যা বলেছে, আর তার পরিণতি কি না নিতাই স্যার ? এই দ্বন্দ্ব তাকে অন্যমনস্ক করে দিল।)

রবি ঃ কী রে কী হল ? কী ভাবছিস ? সিগারেট-টা যে অমন করে ফেলে দিলি ?

কমল ঃ না রে আর নয়, দেখি না চেষ্টা করে ছাড়তে পারি কি না।

রবি ঃ সাবাস্, আমি যখন পেরেছি তুইও নিশ্চয় পারবি।

কমল ঃ ঐ যে বাস এল, চলিরে আবার দেখা হবে।

নমুনা (২) ঃ সৌমী শহর কলকাতার একটি নামী স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। এক ছুটির দিনে মামাবাড়ি থেকে মার সাথে বাসে করে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার পথে তার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। প্রায় ফাঁকা বাসে একটি লোকের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ তার মনে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। সে পরদিন স্কুলে গিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আয়েসাকে টিফিনের সময় সেগুলি গল্প করেছিল।

সৌমী ঃ জানিস, কালকে না বাসে একটা অদ্ভুত লোক দেখলাম।

আয়েসা ঃ অদ্ভুত কেন ? (হেসে) অদ্ভুত পোষাক পরেছিল ?

সৌমী ঃ আরে না না। শোন্ না, লোকটা তো প্রায় টলমল করতে করতে বাসে উঠল, আর আমার পাশে কাটা সিটটাতে বসল, মুখে কি বিচ্ছিরি গন্ধ ! বাপ রে বাপ ! মা আমাকে সরে এসে বসতে বলছিলেন, কিন্তু গন্ধ যায় নাকি ? গা গুলিয়ে উঠছিলো। লাল চোখ দেখে যা ভয় করছিল.....

আয়েসা ঃ ও বুঝেছি, লোকটা তার মানে বদ্ধ মাতাল, মদ খেয়েছিল।

সৌমী ঃ মদ ? সে তো সিনেমার টিভি সিরিয়ালে দেখেছি, মদে বুঝি এরকম গন্ধ ? আর লোকের এই দশা হয় ?

আয়েসা ঃ অতটা বলতে পারব না, তবে মদ যে সুস্থ স্বাভাবিক লোকে খায় না বা মদ খাওয়া ব্যক্তিদের যে কেউ ভালো চোখে দেখে না তা বেশ বুঝতে পারি।

সৌমী : কেন ? তোর এরকম ধারণা হল কেন ?

আয়েসা : আসলে তোর মতো আমারও একটা অভিজ্ঞতা আছে।

সৌমী : কী রকম ?

আয়েসা : আমাদের বাড়িতে যে নমিতাদি কাজ করে সে একদিন মাকে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যখন ওর স্বামীর চাকরি চলে গেল, তখন থেকে সে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকত, এধার ওধার ঘুরত আর তারপরে মদের নেশা ধরল— জানিস তো, এ নেশা একবার ধরলে তা আর সহজে ছাড়তে পারে না। ওর স্বামী এখন নমিতাদির কাছে রোজ টাকা চায় আর টাকা না দিলেই খুব মারধোর করে।

সৌমী : বলিস কিরে। এই লোকটারও গায়ের জামা-কাপড় অত্যন্ত নোংরা, পায়ের চটি-টাও ছেঁড়া, হয়তো এও তোর ঐ নমিতাদির স্বামীর মত.....

আয়েসা : তবে জানিস্‌তো কাল নমিতাদি আসেনি আর আজ সাতসকালে এসে খুব খুশি খুশি ভাবে মাকে একটা খবর দিল।

সৌমী : কী খবর ?

আয়েসা : কালকে সকালবেলা না কি নমিতাদি আর ওদের পাড়ার কয়েকজন মহিলা সবাই মিলে একসাথে গিয়ে বস্তির মোড়ে ঐ মদের দোকানটা ভেঙে দিয়েছে, আর তাই ও কালকে কাজে আসতে পারেনি।

সৌমী : ওমা তাই না কি ? কোন গন্ডগোল হয় নি ?

আয়েসা : একেবারে যে হয়নি তা নয়। তবে পুলিশ আর পাড়ার কিছু ছেলে ওদের সাথেই ছিল। এমন কি, ওদের বাড়ির আশেপাশের বাচ্চারাও মায়েদের সাথে গিয়েছিল মদের ঠেক ভাঙতে।

সৌমী : বাব্বা ! শুনেই তো কেমন কেমন মনে হচ্ছে। তার মানে বুঝলাম যে মদ জিনিসটা অত্যন্ত খারাপ।

আয়েসা : খারাপ মানে ? একেবারে শেষ করে দেয়। শুনেছি তো ওদের বস্তিতে এরকম অনেক লোক ঐ মদের দোকানের আড্ডায় যায় আর মদ কেনার পয়সার জন্য চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করে।

সৌমী : এত দূ......... র.........। হুম, মদ একটা বিচ্ছিরি জিনিস, ছিঃ।

(সৌমীর মদের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মাল। সে বুঝল, মদ কীভাবে মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে, অকেজো করে আর তার সাথে সাথে এই উপলব্ধিও হল যে, ইচ্ছে করলে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করলে সমাজের বুক থেকে এই বিষবৃক্ষটিকে উৎপাটিত করা যাবে। তবে তার জন্য দরকার সচেতনতা)।

(ঢং ঢং করে টিফিন শেষের ঘন্টা পড়ার শব্দ)

আয়েসা : চল্‌, ক্লাসে চল্‌।

সৌমী : চল্ যাই।

● চ. অংকন/পোস্টার প্রদর্শনী ●

অংকন এবং পোস্টার প্রদর্শনী ইদানীং কালে জনপ্রিয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী রূপে পরিগণিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ ধরনের কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে নির্বাচিত বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর তাদের ভাবনাকে ছবি বা পোস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। কোন চিত্র অংকন বা পোস্টার তৈরির আগে ছাত্ররা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং চিত্র অংকন বা পোস্টার তৈরির সময় নিজস্ব গভীর চিন্তন ও কল্পনা প্রয়োগ করে তাতে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে যেমন স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শিক্ষক দিবস, ধূমপান-বিরোধী দিবস, বিশ্ব জল দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব জনস্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ইত্যাদিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা যেতে পারে। যৌথভাবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের কার্যক্রম দক্ষতা অর্জন ও বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক হবে।

অংকন / পোস্টারের বিষয়গুলি হতে পারে—

১। প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন জল, বন, মৃত্তিকা ইত্যাদি) সংরক্ষণ।
২। পণপ্রথার উৎস ও কুফল।
৩। সকলের জন্য শিক্ষা।
৪। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা।
৫। বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক অবসাদ ঘটিত কোনো চিত্র।
৬। সামাজিক পরিবেশের নানা দিক (যথা দারিদ্র্য, অপুষ্টি ইত্যাদি)।
৭। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক।
৮। কুসংস্কার বিরোধিতা।
৯। মনীষীদের জীবন কাহিনি।
১০। রক্ত দাও—প্রাণ বাঁচাও।

● ছ. কেস স্টাডি ●

কেসস্টাডি কি ও কেন?

প্রত্যেকটি কেস-এর কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া হল। এগুলি বিচার করে ঘটনা বা পরিণতির কিছু কারণ খুঁজতে বলা হয়। এই অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও যুক্তি দিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়া এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দেবার দক্ষতা বাড়ানো যায়। এছাড়াও নিজেদের জীবনের নানান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা এবং সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা বাড়ে, আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়।

এক একটি কেস বিচার করার জন্য পাঁচ থেকে আট জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে দল করে দেওয়া যায়। তারা পারস্পরিক আলোচনার ভেতর দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা আগে কেসটি নিজে অনুধাবন করে নেবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম সাহায্য করবেন। নিচে তিনটি নমুনা দেওয়া হল। এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আরো

কিছু কেস তৈরী করে নিতে পারেন।

নমুনা- (১) ঃ অনুপম নবম শ্রেণির ছাত্র, বয়স পনেরোর আশেপাশে। পড়াশোনায় তেমন উজ্জ্বল না হলেও সে যেকোনো খেলায় খুব পটু। তাছাড়া তার স্বভাবের জন্য সে ছোট বড় সবার প্রিয়। বাড়িতে আছেন মা, ছোটবোন আর ঠাকুমা। বাবা চাকরিসূত্রে দূরে থাকেন। মাসে একবার বাড়ি আসেন। কিছুদিন ধরে অনুপমের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সে খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে। খেলাতেও যেন তেমন উৎসাহ নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল অনুপম তার শরীর ও মনের কিছু পরিবর্তন নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের কাছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্তু তার প্রশ্নের সমাধান মেলেনি। দেখা গেছে অনুপম আর কারুর সঙ্গেই মন খুলে কথা বলছে না। ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। কিন্তু অনেকটা সময় সে বাড়ির বাইরে থাকছে এবং দেরি করে বাড়ি ফিরছে, পাশাপাশি পড়াশোনা, খেলা এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে দেখা দিয়েছে তার প্রবল অনীহা।

উপরের বিবরণটি বিবেচনা করে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে হবে।

১। অনুপম কি কারণে সব কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে?

২। অনুপমের বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকার কারণ কি হতে পারে?

৩। অনুপম কার কাছ থেকে সাহায্য আশা করতে পারত?

৪। অনুপমের মতো কোনো অবস্থার সম্মুখীন হলে তুমি কি করতে?

নমুনা (২) ঃ অন্তুকে নিয়ে বাবা-মায়ের ভাবনার শেষ নেই। আগামীকাল থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। বাবার কাপড়ের দোকান এখন কর্মচারী দেখাশোনা করছে। মায়ের মনও আর রান্না বা ঘরকন্নার কাজে নেই। তিনি কখনো কফি, কখনো মুখরোচক খাবার বা ঠাণ্ডা সরবত নিয়ে বারবার দেখে আসছেন ছেলেকে। জ্যেঠা, কাকা, পিসি এমনকী মামাদের বাড়ি থেকেও অন্তুই প্রথম পেরোতে যাচ্ছে স্কুলের গন্ডি। অন্তুর বাবা বুঝুন বা না বুঝুন যখন যেমন শুনেছেন বা অন্তু যেমন বলেছে সেইমত বইপত্র, টিউশন আর নোট জেরক্স করার ব্যবস্থা করেছেন। অন্তুর সারা খাট জুড়ে বই-খাতা, নোটের ফাইল এলোমেলো ছড়ানো। কিছু পড়াশোনা সে করেছে বটে। কিছু ফাঁকিও তো দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে সে সবই ভুলে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলছে আত্মবিশ্বাস। তার একবার মনে পড়ছে বাবা মা আত্মীয়দের আর মাস্টার মশাইদের মুখ আর একবার খাপছাড়াভাবে পড়ার বইয়ের পাতা। কি করবে অন্তু বুঝতে পারে না। অন্তুর বাবা, মা জানেন কখনো ছেলেকে চাপ দিতে নেই বা বেশি নম্বর পেতেই হবে এমন কথা বলতে নেই। তাই কোনোদিন তাঁরা ছেলেকে মুখে বলেননি যে অন্তুর কাছ থেকে তাঁরা কি চান।

কিন্তু এত সুরক্ষা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা আটকানো গেল না। দুপুরে খাবার পর ছেলেকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন মা। বিকেলের আগেই অন্তুর জন্য ফল কেটে ঘরের দরজায় ধাক্কা দেন তিনি। দরজা খুলছে না দেখে দেরি না করে বাড়ির সবাইকে খবর দেন। ততক্ষণে সব শেষ। হাতিবাগানের দড়ি বিক্রেতা জানত না কেন সে একটি কিশোরকে পাঁচ মিটার দড়ি বিক্রি করল। সুইসাইড নোটে কেউ দায়ী নয়......... লেখা থাকলেও অন্তুর বাবা মা আজও এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজেন যে অন্তুর এই অবাঞ্ছিত পরিণতির জন্য কে কতটা দায়ী।

প্রশ্ন ঃ

১। অন্তু এরকম সিদ্ধান্ত নিল কেন?

২। অন্তুর বাবা-মায়ের ভূমিকায় আদৌ কোনো অসংঙ্গতি ছিল কি?

৩। এমন সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্তু কি কি করতে পারত?

৪। তুমি অন্তুর পাশে থাকলে তাকে কিভাবে সাহায্য করতে?

নমুনা (৩) ঃ আরতিদেবীর খুব মন খারাপ। এমন গভীর সমস্যায় এর আগে পড়েছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁদের যৌথ পরিবার এবং যমজ দুই ছেলে জয় আর সুজয়। পড়াশোনা, খেলা, ছবি আঁকা, ব্যবহার— সব বিষয়েই তাঁর ছেলেরা এগিয়ে থাকে। স্কুলে বা আত্মীয় মহলে যথেষ্ট ভাল ছেলে হিসেবে ওদের উল্লেখ করা হয়। সেই ছেলেদের সম্পর্কে যথোপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তারা কিছু দিন ধরে ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

ধূমপানের কারণেই ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে একেবারে মৃত্যুর দরজা থেকে ঘুরে এসেছেন ওদের বাবা শংকরবাবু। এমন একটা সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ছেলেদের সঙ্গো কিভাবে কথা বলবেন ভাবতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন আরতি দেবী। শংকরবাবু কিন্তু তার বিচার বিবেচনা ও অনুভূতি দিয়ে সব ব্যাপারটাই বুঝতে পারেন এবং ছেলেদের (যাদের কাছে তিনি বন্ধুর মতোই) ডেকে পাঠান।

বকাবকি, তর্কবিতর্ক বা অভিভাবক সুলভ উদ্বেগ তথা পরামর্শের মধ্যে না গিয়ে তিনি ছেলেদের সঙ্গো আলোচনা আর কথোপকথনের ভেতর দিয়ে ধূমপানের অভ্যাসটি নিয়ে আলোচনা করেন।

শংকরবাবুর গলার সমস্যাটি নিয়ে প্রসঙ্গা ওঠেনি তাই এ পর্যন্ত বিশদ আলোচনা হয়নি ছেলেদের সঙ্গো। আজ কিন্তু তিনি প্রমাণসহ জানিয়ে দিলেন কিভাবে ধারাবাহিক ধূমপান তার গলায় মৃত্যুকীটের জন্ম ও বংশবিস্তার ঘটিয়েছিল। কেমন করে সেই দুঃসহ রোগাক্রান্ত দিনগুলোর শেষে তিনি সুস্থতার মুখ দেখেছেন।

জয়, সুজয় কথা খুঁজে পায় না। তারা পরস্পরের দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকায় এবং দুই ভাই বোধ হয় মনে মনে শপথ নেয় নিজেরা এবং তাদের বন্ধুদের নিরস্ত করবে এই অসুস্থ অভ্যাসের দাসত্ব থেকে।

প্রশ্ন ঃ

১। শংকরবাবুর ক্যানসারে আক্রান্ত হবার কি কি কারণ ছিল?

২। ধূমপান অভ্যাস পরিহার করার পক্ষে কেমন যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত?

৩। শংকরবাবুর স্ত্রী এত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন কেন?

৪। জয়, সুজয় বন্ধুদের কিভাবে বুঝিয়ে ধূমপান থেকে নিরস্ত করবে?

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবার ঃ আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ ও জীবনমান

সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার হল প্রাচীনতম মানবসংস্থাগুলির একটি। সামাজিক পরিবেশের রূপান্তর ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও এটা সব সমাজের মৌলিক একক হিসেবে টিকে আছে। তবে বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনবিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হয়েছে পরিবারের গঠন, পারিবারিক জীবন এবং পরিবারের কাঠামো।

জনসংখ্যার পরিবর্তন দুটি প্রজন্মের, এমনকি একই প্রজন্মের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের প্রকৃতি, আত্মীয়দের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বয়সগত বিন্যাস পালটে দিয়েছে।

আবার, পরিবারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে সমাজের কিছু পরিবর্তন। যেমন — আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, অভিবাসন (বিশেষত গ্রাম থেকে শহরে) কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বেশি যোগদান, শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি, পারিবারিক পেশা থেকে মানুষের সরে আসা, বিশ্ব অর্থনীতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি। ফলে, মানুষ পরিবারের বন্ধনকে শিথিল করতে বাধ্য হচ্ছে। তবুও পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সব সমাজ। মানুষ পরিবারেই জন্ম লাভ করে, সেখানেই বেড়ে ওঠে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে নিজের একটি পরিবার গড়ে তোলে।

পরিবারের সংজ্ঞা

পরিবারের রূপ ও গঠনে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এখন এই বিভিন্নতা বোধহয় অতীতের চেয়ে বেশি। তাই এর সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণভাবে পরিবার বলতে বোঝায় — একদল ব্যক্তি যারা রক্ত, বিবাহ কিংবা দত্তক সূত্রে সম্পর্কিত এবং সমমানসিকতা যুক্ত, যারা একই গৃহে একই সংস্কৃতি নিয়ে বাস করেন ও যারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন অনুভব করেন এবং একে অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

বিশেষ করে আমাদের সমাজে সবচেয়ে ছোটো পরিবার গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের এক বা একাধিক সন্তানদের নিয়ে। সাধারণভাবে একটি পরিবার গড়ে ওঠে অন্তত প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে নিয়ে, যারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সমাজ-স্বীকৃত সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। তারা এক বা একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে পারেন বা দত্তক গ্রহণ করতে পারেন। এর পাশাপাশি পিতামহ-পিতামহী ও অন্যান্যদের নিয়েও পরিবার গঠিত হতে পারে। এমনকি বিপত্নীক / বিধবা কিংবা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন কোনো পিতা বা মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের নিয়ে পরিবারও সম্ভব।

পরিবারের প্রকারভেদ

ভারতীয় সমাজে পরিবারের মূলত তিনটি রূপ দেখা যায় —

১। যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার; অনেকক্ষেত্রে একে বর্ধিত পরিবারও বলা হয়।

২। আংশিক যৌথ পরিবার।

৩। একক পরিবার।

ভারতীয় সমাজে একসময় যৌথ পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল। যৌথ পরিবারে বাবা-মা ও তাঁদের সন্তানরা একত্রে এক ছাদের তলায় থাকেন। পুরো পরিবারের রান্না একসাথে হয় এবং সাধারণত পারিবারিক সম্পত্তি বা ব্যবসায়ে সকলের ভাগ থাকে। সংসারব্যয় নির্বাহের জন্য কর্মরত সব সদস্য নিজ নিজ আয় অনুযায়ী পরিবারের কর্তাকে আর্থিক সাহায্য করেন। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রেক্ষিতে যৌথ পরিবার খুব সহায়ক ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু সময়ের সাথে নগরায়ন, শিল্পায়নের চাপে যৌথ পরিবারের কাঠামো ভাঙতে লাগল এবং এর স্থান নিতে লাগল একক পরিবার। মানুষের আত্ম-কেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থপরতা বেড়ে যাওয়া এর একটি কারণ। এই ধরনের পরিবারে শুধু স্বামী-স্ত্রী কিংবা স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের একটি বা দুটি সন্তান বাস করে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়।

এই দু'ধরনের পরিবারের মাঝামাঝি পরিবারের আরেকটি রূপ ইদানীং দেখা যাচ্ছে যাকে বলা হয় আংশিক যৌথ পরিবার। এক্ষেত্রে হয়ত সকল বিবাহিত ভাইরা একত্রে থাকে না, কিংবা ভাইয়েরা একই বাড়ির ভিন্ন অংশে বা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে বাস করে। এক বাড়িতে থাকলেও এরা পৃথগন্ন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা থাকে।

পারস্পরিক মতবিরোধ এড়াতে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য একক পরিবারে থাকার প্রবণতা বাড়লেও এর কতগুলো ব্যবহারিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে, বিশেষ করে যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কর্মরত হন। সেক্ষেত্রে সন্তানের নিরাপত্তা এবং দেখাশোনার জন্য হয় কোনো বয়স্ক আত্মীয়কে এনে রাখা হয়, নয়ত তাকে তার দাদু-দিদা বা দাদু-ঠাকুমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ক্রেশের অপ্রতুলতা এবং সেগুলোর প্রতি অনাস্থার কারণে এই ব্যবস্থা।

পরিবারের কার্যাবলি

কোনো সমাজের শক্তি ও সংহতি মুখ্যত সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবারের কার্যাবলির উপর নির্ভর করে। পরিবারে সব সদস্যেরই দায়িত্ব পারিবারিক কর্তব্যগুলো সুসম্পন্ন করা, যদিও সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত থাকে পিতা-মাতার উপরেই। সন্তানদের মধ্যে নানান সমস্যা তৈরি হয় মূলত পিতা-মাতা বা অন্যান্য সদস্যদের কর্তব্যে গাফিলতি বা ঘাটতির কারণে। প্রকৃত সুখী পরিবার গঠনের জন্যে পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজন মেটানো আবশ্যক। প্রয়োজনের মধ্যে থাকে শারীরিক চাহিদা, নিরাপত্তা, মর্যাদা, ভালোবাসা ও আত্মবিকাশের চাহিদা।

পরিবার কতগুলি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন ক'রে সমাজকে সেবা করে

ক) **প্রজনন ঃ** নিজের বংশকে রক্ষা করা সকল জীবের প্রাথমিক ধর্ম। প্রজননের মাধ্যমে তা পালিত হয়। মানুষের প্রজনন মূলত নিজের বংশরক্ষার তাগিদে। মানব-সমাজে দু-জন বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির বিবাহের পর যৌনাচার সমাজ-স্বীকৃত। এই বিশেষ সম্পর্ক প্রজননকে সাহায্য করে। শিশু পরিবারের মধ্যে জন্ম নিয়ে লালিত-পালিত ও বড় হয়, যাতে সে প্রাপ্তবয়স্কের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় এবং বংশবিস্তারের ধারাকে রক্ষা করতে পারে।

খ) **শারীরিক রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** পরিবারকে সঠিকভাবে কার্যকর রাখতে সদস্যদের শারীরিক সক্ষমতা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। এজন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সম্যক প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যরা যখন খুব ছোট থাকে তখন এই প্রয়োজনগুলো মেটানো পিতা-মাতার কর্তব্য। এগুলোর পর্যাপ্ত যোগান দেওয়ার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও রোগ ও আঘাত থেকে সদস্যদের মুক্ত রাখাও প্রয়োজন।

গ) **সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ** জন্মের পর থেকে পরিবারের মধ্যে শিশুকে সমাজ-স্বীকৃত আচরণ শেখানো হয়। গুরুজনদের আচরণ, উপদেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এবং নানাবিধ উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই শেখানোর কাজ সম্পন্ন হয়। পরিবারে যে ব্যবহার শেখানো হয়, সেইটিই একদিন সামাজিক আচরণের ভিত হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে প্রবাহিত হয় সংস্কৃতির স্রোত। তাই, সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য শৈশব থেকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সামাজিকীকরণের প্রকৃত অর্থ যৌথ জীবনযাপনের উপযুক্ত মানসিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও অভ্যাস সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা।

ঘ) **শিশুর সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্টকরণ ঃ** জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার আমাদের ওপর একটি অবস্থান আরোপ করে দেয়, যেমন, জাতি, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি। আমরা যাতে বড় হয়ে সমাজের চোখে একটি উচ্চতর আসনে পৌঁছতে পারি সেজন্য পরিবার আমাদের সাহায্য করে।

পারিবারিক সম্পদ

পরিবারের প্রয়োজন অসীম কিন্তু উপকরণ সীমিত। পরিবার কিংবা ব্যক্তিমানুষ তার সীমাহীন প্রয়োজন মেটাতে মানবিক সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করে। এর মধ্যে আছে পরিবারের বিভিন্ন ধরনের আয় ও সম্পদ। সেইসব সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তা থেকে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। জীবনের নানা পর্যায়ে প্রতিটি ঘটনাই সম্পদের ব্যয় ঘটায়। পরিবারের সম্পদের উপর চাপ খুব বেশি —বিশেষত যখন বিভিন্ন পর্যায় একে অন্যের সাথে মিশে যায়। তাই নবদম্পতির পক্ষে বিবাহের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই ঠিক করে নেওয়া জরুরি যে কখন তারা প্রথম সন্তানকে আনবেন, মোট কটি সন্তান চান এবং সন্তানদের মধ্যে কতটা সময়ের ব্যবধান থাকবে।

সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত বস্ত্র, বাসস্থান, সঠিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ একটি সুস্থ সবল জীবনের প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক উপাদান পাবার অধিকার প্রত্যেক শিশুর আছে। পরিবারের আয়তন তার সদস্যদের প্রয়োজনগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাবিত করে।

পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে পরিবার তাদের বিশেষ কর্তব্যপালন আশা করে। বিভিন্ন সদস্যের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সামাজিক রীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কিছু স্বীকৃত সামাজিক রীতি আছে যাদের স্থান, কাল, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং সংস্কৃতি ভেঁদে ভিন্ন প্রয়োগ বা রূপ দেখা যায়। যেমন—সহযোগিতা, অন্যদের অধিকারকে মর্যাদা দেওয়া, মানবপ্রীতি, সুস্থ আচরণ, পারিবারিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক প্রভৃতি। এই রীতিগুলো শিখে নিতে হয় পরিবার, বিদ্যালয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ

থেকে। সামাজিক রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তির আচরণকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিবারের সদস্যদের প্রত্যাশিত ভূমিকা ও বাস্তব আচরণের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য কিছু অধিকার ও সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং তাদের কিছু দায়িত্বও থাকে। প্রত্যেক সন্তানেরই যেমন মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা ও যত্ন পাবার অধিকার আছে, তেমনি তার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

যেকোনো পরিবারে নারী-পুরুষ সদস্যরা সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিরাচরিৎভাবে কিছু ভূমিকা নারীদের এবং অন্য কিছু ভূমিকা পুরুষের জন্যে ধার্য করা আছে। দেখা যায় ঘরের কাজগুলি শুধু মেয়েরাই করে থাকেন। শিশুকে লালনপালন করার সব কর্তব্যই মায়েদের বলে ধরে নেওয়া হয়। এই ভূমিকাগুলি অপরিবর্তনীয় নয়। প্রয়োজন অনুসারে এই ভূমিকা পাল্টা-পাল্টি করা যায়। শিশুর স্বাভাবিক গঠন ও সার্বিক উন্নতি তখনই হয়, যখন পিতা-মাতা দুজনেই তাদের যত্নের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। সন্তানের পরিচর্যার দায়-দায়িত্ব পালনে পিতাও অংশ নেবেন এটা আশা করা যেতে পারে। যখন পুরুষ সদস্য নারী সদস্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্তানের পরিচর্যাসহ পরিবারের কাজকর্ম করেন তখনই পারিবারিক জীবনের মান উন্নত হয়।

এখন আমাদের জানতে হবে একটি সমাজের বা দেশের জীবনের গুণগত মান বলতে কি বোঝায়। এর দুটি দিক আছে—আর্থিক এবং সামাজিক। আর্থ-সামাজিক মানের কয়েকটি নির্ধারক আছে, যেমন—

১। শিশু মৃত্যুর হার,
২। বয়স্ক সাক্ষরতার হার,
৩। ক্রয়ক্ষমতা (বাজার-অর্থনীতি),
৪। প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার,
৫। জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল,

এই নির্ধারকগুলিকে জনবিন্যাসের সূচকও বলা হয়।

সামাজিক মানের নির্ধারক হিসেবে সাধারণভাবে নাগরিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার গণ্য হয়। অনেকে মনে করেন কাজের বা আয় করার অধিকারও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সমাজজীবনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করতে প্রাথমিক একক হিসেবে প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব পালন করা কাম্য।

শিক্ষা, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা, দেশের জীবনের গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ধরে নেওয়া হয় যে শিক্ষিত মায়ের সন্তান শিক্ষিত হবে এবং তাদের জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হবে। মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার প্রধান সুফলগুলি হল—

১। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি,
২। প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা,
৩। উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠা, আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি,
৪। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা গড়ে তোলা,
৫। সন্তানদের শিক্ষায় সাহায্য ও উৎসাহিত করা।

এই শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া মূলত রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য পরিবারের উদ্যোগ গ্রহণও প্রয়োজন।

বেশী সন্তানধারণের প্রবণতা এবং সেই সঙ্গো মৃত্যু হার ক্রমান্বয়ে কমে আসার ফলে বেশিরভাগ সমাজের জনসংখ্যার বয়োক্রমিক বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রবীণদের সংখ্যা ও অনুপাত নজিরবিহীনভাবে বাড়ছে। বেশি উন্নত অঞ্চলগুলিতে বর্তমানে প্রতি ছয় জনের মধ্যে এক জন অন্তত ৬০ বছরের উর্ধ্বে। ২০২৫ সালের মধ্যে তা হয়ে দাঁড়াবে প্রতি চারজনে একজন। যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সন্তানধারণ ক্ষমতা অতি দ্রুত কমে গেছে সেগুলি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। অধিকাংশ সমাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশিদিন বাঁচে। তাই প্রবীণদের জনসংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধারাই বেশি। অনেক দেশেই দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বিশেষভাবে সমস্যায় জর্জরিত। সংখ্যাগতভাবে এবং কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রবীণদের অংশের ক্রমাগত বৃদ্ধি অনেক দেশের পক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে প্রবীণ মানুষদের সহায়তা দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থাগুলিকে টিকিয়ে রাখা এবং বয়স্ক জনসংখ্যার এই চাপের প্রভাব সব সমাজের সামনেই এক সুযোগ এবং একটি চ্যালেঞ্জ। সরকারের পক্ষ থেকে বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য নানারকম সুবিধা চালু করা হয়েছে, যেমন ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে জমা আমানতে বাড়তি সুদের হার, রেলে ও বিমানে যাতায়াতের ভাড়ায় ছাড় ইত্যাদি।

পরিবারের প্রবীণ সদস্য / সদস্যাদের বিশেষ যত্ন এবং মানসিক নিরাপত্তার প্রয়োজন। তাঁদের যত্ন নেওয়া এবং সম্মান জানানো পরিবারের সব সদস্যেরই দায়িত্ব। তাঁরা পরিবারের এক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিবারে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সদস্য থাকে তবে তাদেরও বাড়তি সহযোগিতা করা, যত্ন নেওয়া পরিবারের অন্য সদস্যদের কর্তব্য।

দায়িত্বশীল পিতামাতা হয়ে ওঠার জন্য কয়েকটি বিষয় নীচে দেওয়া হল

১। যদি পিতা-মাতা ক্ষুধা এবং নিরাপত্তার আশঙ্কা থেকে পরিবারকে মুক্ত রাখতে চান, তবে তাঁদের উচিত প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া যে তাঁরা নিজেদের বাস্তব ক্ষমতার মধ্যে যে কজন সন্তানের লালন-পালন করে বড় করতে পারবেন, সেই সংখ্যক সন্তানেরই জন্ম দেবেন।

২। পিতা-মাতা যদি বেশী বয়সে সন্তানের সঙ্গো সম্পর্ক নিয়ে নিঃসন্দেহ হতে চান, তবে সন্তানদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে, নিজেদের পরিস্থিতিকে স্বাধীনভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের জন্যে তৈরি করে দিতে হবে।

৩। পিতা-মাতা বিশৃঙ্খলার হাত থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে চাইলে এমন পরিবার গড়ে তুলবেন যার সদস্যরা সমাজ থেকে শুধু সুবিধা পাওয়ার অধিকারের কথাই জানবেন না, সমাজকে সাহায্য করার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন থাকবেন।

৪। স্বামী-স্ত্রী পরিবারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেও যদি পরস্পরের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেন, তবে বিবাহিত জীবনে তিক্ততা, বিচ্ছিন্ন হবার কিংবা তাতে ছেদ পড়ার সম্ভাবনা থেকে তাঁরা মুক্ত থাকেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, পিতা-মাতা নিজেদের ভূমিকা পালনে সক্ষম হলে স্বভাবতই তাঁরা দায়িত্বশীল পিতা-মাতা হতে পারবেন এবং নিজের প্রতি, জীবন সঙ্গী / সঙ্গিনীর প্রতি, সন্তানদের প্রতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনেও বিশেষ অসুবিধায় পড়বেন না।

বিবাহ এবং পরিবার

সাধারণভাবে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে দাম্পত্যজীবন ও একটি নতুন পরিবারের সূচনা হয়। বিবাহ সংঘটিত হয় ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া কিংবা আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে। সচরাচর সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা ব্যাপক পরিচিতি বা অনুমোদন পায়। মূলত দুজনের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপর নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাক্-বিবাহ সিদ্ধান্তগুলি অভিভাবকরাই নিয়ে থাকেন।

নর-নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে উভয়ের মুক্ত এবং পূর্ণ-সম্মতির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য দিক। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিয়ে দেবার রীতি বাল্যবিবাহ প্রথাকে জোরদার করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনও সেই ধারা অনুসৃত হতে দেখা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন, নর-নারীর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে পরিণত হবার আগে বিবাহ হলে পারিবারিক জীবনে তার কু-প্রভাব পড়তে পারে। ভারতে আইন সম্মত বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্দিষ্ট হয়েছে — মেয়েদের জন্যে ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্যে ২১ বছর।

সুখী বিবাহিত জীবন নির্ভর করে কতকগুলি বিষয়ের উপর। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দুজনকেই আগে বিবাহের গুরুত্ব এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ বুঝে নিতে হয়। পরস্পরের বোঝাপড়া এবং সম্মানের উপর এই সম্পর্ক নির্ভর করে। সবসময়েই বুঝতে হবে যে দুজনেই সমান অংশীদার এবং প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসাবে সমৃদ্ধ হবার স্বাধীনতা আছে, কেউ কারুর অধীনস্থ নয়।

ভারতে এখনো সম্বন্ধজনিত বিবাহের প্রচলন রয়েছে। তাতে কখনো কখনো এমন ঘটে যে, ছেলে-মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও পারিবারিক চাপে পড়ে বিবাহ করতে তারা বাধ্য হয়। এর ফল সর্বদা ভালো না-ও হতে পারে, বিশেষ করে যখন স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতায় অমিল থাকে।

দু'জনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ এবং পারিবারিক দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা থাকা দরকার। দুজনকেই বুঝতে হবে যে দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন যোগাযোগ ঘটে, তখন মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একে অন্যের মতকে মর্যাদা দিয়ে এবং সহনশীলভাবে মেনে নিয়ে গঠনমূলকভাবে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব

পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতার অর্থ হচ্ছে এই ভূমিকায় নিজেদের অংশ ভাগ করে নেওয়া। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ও একটি পরিবার গড়ে তোলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল বংশবিস্তার। পিতা-মাতা সন্তানকে পৃথিবীতে আনেন এবং তাকে লালন-পালন করেন। আগে থেকে পরিকল্পনা করে ভবিষ্যতের জন্য সব ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার যৌথ দায়িত্ব। মা-বাবার দায়িত্বর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলো গর্ভধারণ, প্রাক-প্রসব যত্ন-পরিচর্যা, শিশুর জন্মদান, প্রসব-পরবর্তী শিশুর যত্ন, বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষ্যে সন্তানের লালন-পালন। এ বিষয়ে উভয়েরই পরস্পরের দায়িত্ব ও ভূমিকাকে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন।

প্রকৃতিতে লক্ষ্য করা যায় — মা-পাখি ডিম পাড়ার আগে তার সঙ্গী পুরুষ পাখিটির সঙ্গে মিলেমিশে বাসা তৈরি করে। আমরা আরও লক্ষ্য করি — দুজনে পালা করে ডিমে তা দেয়। তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা তৈরি হলে তাদের বড়ো হওয়া পর্যন্ত আহার যোগায়। পিতা-মাতার ভূমিকা সম্পর্কে এটি একটি উপযুক্ত উদাহরণ।

সুস্থ মা হলেন একটি সুখী পরিবারের ভিত্তিস্বরূপ। সন্তানসম্ভবা নারীর দৈহিকভাবে পূর্ণ পরিণত এবং যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী হওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনি গর্ভধারণের এবং শিশুর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও যত্ন করার দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। সাধারণত একটি বিশেষ বয়সের আগে এই সামর্থ্য অর্জন করা যায় না। শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ভাবী মা-কে মানসিকভাবেও সন্তানজন্মের পূর্বে এবং পরে যা প্রয়োজন, সেগুলি বোঝার এবং মেনে চলার মত যথেষ্ট পরিণত হতে হবে। গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ নির্ভর করে ভাবী মায়ের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার ওপর। সেইজন্য ভাবী মায়ের মানসিক ভারসাম্য থাকা আবশ্যক যা পরিণত বয়সেই আসে।

শিশুর লালন-পালনের ক্ষেত্রে নারীও সমান অংশীদার। এবং তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা আছে। তবে সমস্যা দেখা দিতে পারে সেইক্ষেত্রে যখন একটি মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়। এসব ক্ষেত্রে তার গৃহবধূর জীবনযাপন ছাড়া অন্য সব সম্ভাবনা হারিয়ে যায়। কারো স্ত্রী এবং কারো মা হওয়াতেই তার জীবন সীমাবদ্ধ হয়। এটা ঠিক যে নারীজীবনে এই দুটি বিষয় খুবুই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ দুটির সঙ্গে নারী আরও অনেক ভূমিকা পালনে সক্ষম। যদি তাঁরা পর্যাপ্ত শিক্ষা লাভ করতে পারেন, তবে ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের চর্চাও করতে পারেন যাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের গুণাবলী প্রকাশের সামর্থ্য আসে। এতে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। শুধু তাই নয়, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য তারা আরও সফলভাবে পালন করতে পারেন। স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকাতেও তাঁরা আরও কৃতী হতে পারবেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও সাধারণ রোগ-ব্যাধি বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান নিজেদের এবং শিশু সন্তানের যত্ন নেবার সহায়ক হয়। এইভাবে তাঁরা পারিবারিক জীবনে প্রত্যাশিত আনন্দের ভিত গড়তে পারেন।

মেয়েরা বর্ধিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা পেলে বেশি সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবদান রাখার নতুন দিগন্ত তাঁদের সামনে খুলে যায়। এইসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে তাঁরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, সামাজিক এমনকি বিশ্ব-স্তরে পুরুষের সমান অংশীদার হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, শুধু স্বামীর বা পরিবারের লেজুড় হিসাবে নয়।

এটা সত্যিই আশাব্যঞ্জক যে এখন অনেকেই চাইছেন বিবাহিতা মহিলারাও ঘরের বাইরে কাজ করার নতুন ভূমিকায় আসুন। ফলে তাঁরা বিভিন্ন দিক দিয়ে পরিবার ও সমাজের কল্যাণে সাহায্য করতে পারেন। সন্তানধারণ ও তাদের লালন-পালনের চিরাচরিত ভূমিকার সঙ্গেই তাঁরা এটা করতে পারেন। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বিভিন্নভাবে ঘরে এবং বাইরে মহিলাদের সাহায্য করতে পারেন, এটা তাঁদের অবশ্যকর্তব্য।

সাধারণভাবে আশা করা হয় মহিলারা কর্মস্থলে যাবার আগে ঘরের কাজ করবেন এবং ঘরে ফিরে এসেই স্বামীর ও সন্তানদের পরিচর্যা ও সেবা করবেন। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় এটাও তো প্রত্যাশিত যে, স্বামীরা ঘরের সমস্ত কাজে সমানভাবে স্ত্রীদের সাহায্য করবেন। যেমন ধরা যাক, শিশুকে বিদ্যালয়ে যাবার জন্যে তৈরি করা, শিশুর বাড়ির কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি।

শিশুর দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব গঠনে মা-বাবা যা করতে পারেন

ক) অন্যের প্রতি, বিশেষত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ

শিশুরা যদি এটির মূল্য অনুধাবন করতে এবং একটি স্পষ্ট মূল্যবোধ হিসেবে এটিকে গ্রহণ করতে পারে, তবে সম্ভবত তারা অন্যের প্রতি পীড়াদায়ক ব্যবহার করা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে। মেয়েদের অধিকার ও অনুভূতির প্রতি ছেলেদের সংবেদনশীল হবার শিক্ষা লাভ করার বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের মধ্যে এই শিক্ষার বেশিরভাগই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বালিকা ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর জোর দিতে হবে। ক্ষতিকারক কার্যকলাপ এবং তাদের কুফলগুলিকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার — এই বিষয়টি লিঙ্গ সম্পর্কিত সব প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে লিঙ্গ সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়াই নয়, মূল বিষয়টি হচ্ছে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

খ) পরিবারে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের আত্ম-মর্যাদার বিকাশসাধন

মেয়েদের ক্ষেত্রে বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের পরিচিত করিয়ে দিতে হবে জীবনযাপনের বিভিন্ন বিকল্প পথগুলির সঙ্গে (যেমন—চাকরির সুযোগ ইত্যাদি) যেগুলি তাদের সামনে খুলে যাবে যদি তারা শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রভৃতি এড়িয়ে যায়।

যেসব মেয়েদের আত্ম-মর্যাদাবোধ কম, সমাজে তাদের অবদান খুবই সীমিত। এমন নারীরা শুধু সন্তানধারণকেই মূল্যবান উৎপাদন বলে মনে করেন এবং সেই পথেই নিজেদের মূল্য বাড়াতে চান। কোনো ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রাও তাঁদের এই ধারণাকে সমর্থন করে থাকেন। সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় অবদমিত নারীর জীবনে সন্তানধারণকে শিশু ও তার পিতার কাছ থেকে কাম্য ভালোবাসা আদায় করার উপায় হিসাবেও দেখা হয়। অল্পবয়সে শিশুর জন্মদান একটি মেয়ের জীবনের অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিকে সীমিত করে দেয়।

আত্মমর্যাদাবোধ নিজের মূল্য সম্বন্ধে ধারণার মূল ভিত্তি। কেবলমাত্র নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি করাটাই যথেষ্ট নয়। বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব প্রতিফলিত হয় কিভাবে তারা নিজেদের ভবিষ্যতকে দেখে তার ওপর। যদি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা থাকে, তবে কাজে বেশি প্রেরণা আসে এবং তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। শিশুদের নিজেদের জন্য একটি ভবিষ্যৎমুখী ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবার সাহায্য করে। শিশুদের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও আশাবাদ অর্জন করার জন্যও পিতামাতা সাহায্য করতে পারেন, নিজেরা কি হয়ে উঠতে পারে এই বিষয়ে শিশুদের মনচ্ছবি প্রসারিত হওয়া দরকার। এটা হলে নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে একটি স্থায়ী ধারণা গড়ে ওঠে।

যথাযথ মূল্যবোধ না থাকলে পরিবার ব্যবস্থার একটি সম্ভাব্য নেতিবাচক দিক হল দমন বা শাসন যা দু-ধরনের হতে পারে —

১। বড়দের অতিরিক্ত শাসন ছোটদের ওপর,

২। পুরুষ দ্বারা নারীর দমন,

— দুটোই আধিপত্যমূলক মনোভাবের ফল।

প্রথমটির কুফল হিসাবে আমরা দেখতে পাই বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব, সন্তানদের বাবা-মাকে এড়িয়ে চলা ও অগ্রাহ্য করার প্রবণতা, মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি। স্নেহ এবং শাসনের ভারসাম্য বজায় না রাখতে পারার পরিণতি অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

পুরুষের নারীকে দমন করা তো সর্বজনবিদিত। এর থেকেই জন্ম নেয় নানারকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত সামাজিক রীতি।

<u>সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও পরিবারের আয়তন</u>

মূল্যবোধ দীর্ঘসময় ধরে গড়ে ওঠে এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। মূল্যবোধের শিক্ষা আসে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে গড়ে ওঠা সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে।

তবে কোনো এক সময়ে বা স্থানে প্রচলিত হয়েছিল বলেই কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেওয়া উচিত নয়। আচরণ, বিশেষত সন্তানধারণ সংক্রান্ত আচরণ, অবশ্যই পরিবার ও সমাজের চাহিদা মেটাবার মতো হবে। তাই যথাযথ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে আচরণকে উন্নততর করার জন্য মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জন প্রয়োজন। আবার পরিবার ও সমাজের প্রয়োজন এবং অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। এই জন্যই মূল্যবোধ ও আচরণকে পরিবর্তিত চাহিদা ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এই যুক্তিতে পরিবারের আকার সংক্রান্ত মূল্যবোধগুলিকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সেগুলি পরিবর্তিত চাহিদা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। যে মূল্যবোধগুলিকে দেখা যাবে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের কল্যাণসাধনকারী সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, আর যেগুলি পরিবার ও সমাজের জীবনমানের পক্ষে হানিকর সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। অনেক সময় আবার দুটি মূল্যবোধের মধ্যে সংঘাত ঘটে যদি মূল্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত থাকে, যেমন বিদ্যালয়ে একরকম এবং পরিবারে অন্যরকম মূল্যবোধ শেখানো হয়। যদি দুটি সুস্থ মূল্যবোধের মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়, তখনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের অন্যতম পথ হতে পারে বিকল্প দুটির সুবিধা-অসুবিধা, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত দিকগুলি মূল্যায়ন করা এবং নিজের পরিবারের, গোষ্ঠীর বা জাতির ওপর এদের ফলাফলগুলি বিচার করে দেখা। এই বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে চলেছে তার অন্যতম কারণ হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণাগুলি যা বড় পরিবারের পৃষ্ঠপোষক। এগুলিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক।

১। <u>অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা ও প্রথা</u>

উন্নয়নশীল দেশগুলির একটি প্রচলিত বিশ্বাস শিশুদের অর্থনৈতিক সহায়ক হিসেবে গণ্য করে। এমন কথা প্রায়শই শোনা যায় — "ছেলেমেয়ে যত, ঘরে-বাইরে কাজের সহায়ক তত", "ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা" এবং "বেশি ছেলেমেয়ের অর্থ হল পরিবারের অধিক আয়ের উৎস"।

গ্রামাঞ্চলে প্রধানত ৯ বছর বয়স থেকে বা তার আগেই সন্তানকে কৃষিকাজে সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করতে দেখা যায়। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা চারারোপণ, আবর্জনা পরিষ্কার এবং ফসল তোলার কাজে সাহায্য করে। আবার ঘরে তারা ছোটো ভাই-বোনদের এবং বৃদ্ধ সদস্যদের দেখাশোনা করে। রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ, জল তোলা, জল আনা আরও নানান গার্হস্থ্য কাজে তাদের সাহায্য লাগে।

কোথাও দোকান, রেস্তোরাঁ ও হস্তশিল্প প্রভৃতি নানান ছোটো পারিবারিক ব্যবসায়ে পরিবারের আয়বৃদ্ধিতে তারা মূল্যবান সহায় হিসাবে কাজ করে।

বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে বৃদ্ধ বয়সের সুরক্ষা প্রত্যাশা করেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁরা আর রোজগার করতে পারবেন না, নিজেদের যত্ন নিতে পারবেন না, বেশি সন্তান থাকলে, সেই বয়সে আর্থিক সাহায্য ও শারীরিক যত্ন সম্পর্কে তাঁরা বেশি নিশ্চিন্ত থাকেন। সুতরাং সন্তানদের কখনোই অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে দেখা হয় না। অনেক বাবা-মা-ই এটা বিবেচনায় রাখেন না যে, ১০-১৫ বছর ধরে ছেলেমেয়েদের তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য দরকারি বিষয় যোগাতে হবে যতক্ষণ না তারা উৎপাদক ও উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে। বাবা-মা-রা অনেক সময় এটাও বোঝেন না যে তাঁদের পরিবারের আকার যত বাড়বে, সীমিত আয়ের কারণে সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ তত কমবে। এর ফলে তাদের উপার্জন বাড়াবার ক্ষমতাও কমে যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্রের জন্য এবং শিক্ষার অভাবে পরিবারের আয়তন ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা পিতা-মাতার থাকে না।

২। <u>সামাজিক - সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও রীতি</u>

ক) পুত্রসন্তানের প্রতি আগ্রহ ঃ পুত্র সন্তান কামনা এশিয়া মহাদেশে একটি সাধারণ মানসিকতা। চীন দেশেও মেয়ে সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান বেশি পছন্দ করা হয়।

ভারতীয় নারীদের চিন্তাও প্রায় একই রকম। মর্যাদা এবং ক্ষমতা অর্জন করতে হলে একটি ভারতীয় মহিলার অন্তত একটি পুত্র সন্তান থাকতেই হবে, কয়েকটি হলে আরও ভালো হয়। বিশেষ কিছু ধর্মীয় সংস্কৃতির বিশ্বাস অনুযায়ী পুত্র সন্তান পিতার আত্মার মুক্তির জন্য ধর্মীয় আচার পালন করে, বংশ রক্ষা করে, পরিবারকে সুরক্ষা ও ধর্মীয় অধিকার দেয়। এছাড়া পুত্র সন্তান বিবাহের সময় পণের অর্থ ও সামগ্রী আনে। পক্ষান্তরে কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য পিতা-মাতাকে পাত্র পক্ষের চাহিদা মেটাবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই কারণেই কন্যা সন্তান অবাঞ্ছিত এবং পুত্র সন্তানই কাম্য।

এশিয়ায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, পরিবারগুলি অনেক কন্যা সন্তান থাকলেও অন্তত একটি পুত্র সন্তান লাভের চেষ্টা চালিয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে প্রযুক্তির সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ (যদিও তা আইনত নিষিদ্ধ) ও কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছে, বিশেষ করে স্বচ্ছল ও আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে। এই প্রবণতার ভয়াবহ পরিণাম হয়ে দাঁড়াচ্ছে নারী পুরুষদের প্রতিকূল অনুপাত যা ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তবে এখন মেয়েদের অফিসের কাজ, ব্যবসায়ে নিযুক্তি, রাজনীতিবিদ হবার মতো অনেক স্থান অধিকার করতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলি একসময় শুধু পুরুষদেরই দখলে ছিল।

মেয়েদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে জনগণকে কন্যা সন্তানের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এটাও জানাতে হবে যে মেয়েরাও (বিবাহিত বা অবিবাহিত) বাবা ও মায়ের সম্পত্তিতে সমান ভাগের অধিকারী, যদি না তাঁরা অন্যরকম কোনো উইল করে দিয়ে যান। এতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে পুত্র সন্তানের যে বেশি মূল্য, সেই ধারণা খানিকটা খর্ব হবে।

খ) বিবাহ সম্পর্কিত বিশ্বাস ঃ বিবাহ সম্পর্কিত নানান বিশ্বাস বড় পরিবারের অনুকূল। সন্তানের জন্ম না হলে একটি বিবাহকে সফল বলে মনে করা হয় না। একটি নিঃসন্তান দম্পতিকে অবজ্ঞা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আশা করেন যে, নবদম্পতিদের বিবাহের একবছরের মধ্যে একটি সন্তান জন্মাবে। স্বামী এই প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে উপহাসের পাত্র হন এবং অক্ষম ও অপূর্ণ পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তানহীনতার জন্য দায়ী করা হয় স্ত্রীকে, এবং স্বামীকে আবার বিবাহ করার জন্য প্ররোচিত করা হয়।

সমাজের কোনো কোনো অংশে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি বা দুটি সন্তানের জনক, সে সাধারণত দুর্বল ও আদর্শপুরুষ নয় — এমনভাবে বিবেচিত হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের প্রত্যাশার উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য এইসব ধারণা ও বিশ্বাস দম্পতিদের প্ররোচিত করে বেশিসংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে।

গ) নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে ধ্যানধারণা ঃ নারীর চিরাচরিত ভূমিকাই অনেক সন্তানের জননী হওয়াকে উৎসাহিত করে। এই ধ্যানধারণা অনুযায়ী নারীর স্থান শুধু গৃহে এবং পরিবারে নারীর কাজ সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং তাদের লালন-পালন করা।

ভারতে নববধূদের আশীর্বাদের এক কালের প্রচলিত বয়ান হল, "বহু পুত্রের জননী হও"। বড়ো পরিবারে কর্তৃত্ব করার জন্য ভারতীয় গৃহবধূকে অবশ্যই অনেকগুলি সন্তান ধারণ করতে হবে আর তাদের বড়ো করে তুলতে হবে। তবে ভারতে আধুনিক যুগে নারীসমাজে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রচলিত সেই ধারণা দ্রুত তাৎপর্য হারাচ্ছে। তাছাড়া নারীদের জন্য কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় পরিবারের হিত সাধনসহ সমাজ ও জাতির উন্নতিকর্মে তারা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারছে।

যদিও বর্তমানে এইসব বিশ্বাসের ও মূল্যবোধের প্রভাব ক্ষীয়মান। তবু পরিবারের ব্যাপ্তি ও প্রসার বিষয়ে এখনও এগুলি অনেক দম্পতির পরিবারের আকার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনগণকে যুক্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রচলিত সেই ধারণা এবং মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন কিংবা তাদের অভিমুখ পালটানো, যেগুলি পরিবারের আয়তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও পরবর্তী আচরণকে প্রভাবিত করে। যথাযথ জনশিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারাই এইসব ক্ষতিকর সংস্কার ও আচরণ দূর করা সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা — জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নির্ধারক

ভূমিকা

মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সাফল্য। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে জন্মোত্তর জীবনকাল প্রায় ২০ বছর বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং জন্মের এক বছরের মধ্যে শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উৎকর্ষের ফল প্রত্যাশিত জীবনকালের বৃদ্ধির ভেতর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ শিশুর টিকাকরণ এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি যথা পানীয় মারফৎ 'ডিহাইড্রেশনের চিকিৎসা' অধিক সংখ্যায় শিশুর প্রাণরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে।

সারণি ৫.১ ঃ ভারতের গণপরিসংখ্যানগত সাফল্য

জাতীয় পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা প্রবর্তনের অর্ধশতাব্দী পরে ভারতে

- অপরিশীলিত জন্মহার ১৯৫১ সালে শতকরা ৪০.৮ থেকে ১৯৯৯ সালে শতকরা ২৬.১-এ হ্রাস পেয়েছে।
- শিশু মৃত্যুহার অর্ধেক কমে গিয়ে ১৯৫১ সালে হাজার প্রতি ১৪৬ থেকে ১৯৯৯ সালে হাজার প্রতি ৭২-এ দাঁড়িয়েছে।
- দম্পতি সুরক্ষা হার চতুর্গুণ হয়ে ১৯৭১ সালে শতকরা ১০.৪ থেকে ১৯৯৯ সালে শতকরা ৪৪ হয়েছে।
- অপরিশীলিত মৃত্যুহার ২৫ থেকে কমে ৮.৭ হয়েছে।
- প্রত্যাশিত জীবনকাল বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ বছর থেকে ৬২ বছর হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতিসমূহ প্রায় সর্বজনীন সচেতনতা লাভ করেছে।
- সন্তান উৎপাদনের হার সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেয়ে ১৯৫১ সালে শতকরা ৬.০ থেকে ১৯৯৯ সালে শতকরা ৩.২ দাঁড়িয়েছে।

(সূত্র — জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০, ভারত সরকার)

এ সত্ত্বেও এই সাফল্যগুলি সকলের কাছে পৌঁছয়নি ও চিকিৎসাসাধ্য রোগসমূহ আজও কৈশোরে মৃত্যুর মূল কারণ। তদুপরি জনসংখ্যার সিংহভাগ এখনও পরিশ্রুত জল ও পয়ঃপ্রণালীর সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং ঘিঞ্জি পরিবেশ ও পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। জনগণের এক বিরাট অংশ ক্রমাগতভাবে সংক্রামক, পরজীবী এবং জলবাহিত রোগাদি যেমন — যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক এবং টাইফয়েড ইত্যাদির ঝুঁকিতে থাকেন। তদুপরি পরিবেশের অবনতি এবং কর্মস্থলে বিপজ্জনক বস্তুর উপস্থিতির ফলে স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুরূপভাবে ক্রমবর্ধমান তামাক সেবন, মদ্যপান এবং মাদক গ্রহণ নবীন এবং প্রবীণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলির উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ঘটায়। বহুদেশে বাজারমুখী উদার অর্থনীতি অনুসরণের ফলে স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন হয়েছে। এই প্রবণতা জীবনযাত্রা প্রণালী, জীবিকা এবং ভোগের বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তনকে ব্যাহত করেছে এবং এগুলি ক্রমবর্ধমান অসুস্থতা

ও মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের নামে উন্নত দেশগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পরামর্শ দিয়ে ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইকে একমুখী করে দিয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক সংস্কার ধারণযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, এইসঙ্গো সামাজিক বিষয়গুলির দিকে সমান দৃষ্টি দেওয়াও অপরিহার্য। সামাজিক বিষয়ের মধ্যে আছে স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা।

১। **স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা**

একটি কাজ চালাবার মত সংজ্ঞা অনুসারে ''স্বাস্থ্য হল শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক সুস্থতা''। স্বাস্থ্যের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যাতে বলা হয়েছে, ''স্বাস্থ্য এক সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা, শুধুমাত্র রোগব্যাধির অনুপস্থিতিই নয়।" এই সংজ্ঞা তিনটি বিশেষ দিককে আরও বিবেচনা করার ওপর জোর দেয়, যেমন — শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক। এটি আরও একটি মূল্যবান দিক নির্দেশ করে যে কেবলমাত্র রোগ থেকে মুক্ত থাকাই স্বাস্থ্য নয়।

দৈহিক স্বাস্থ্য ঃ

দৈহিক স্বাস্থ্য নিম্নলিখিত মানদণ্ডের দ্বারা নিরূপিত হয়। যথা —

(১) অসুস্থতার বিশদ পরিচয় — (ক) ব্যাধির ধরন, (খ) হার

(২) ঘাটতির লক্ষণ সমূহ

(৩) শারীরবৃত্তীয় পরিমাপ পদ্ধতি

(৪) কর্মদক্ষতা

মানসিক স্বাস্থ্য ঃ

প্রাচীন ধারণা থেকে আমরা ক্রমাগত জেনে আসছি যে 'সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস'। এটি বর্তমানে পুনরায় সু-প্রতিষ্ঠিত যে দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করা বেশ কঠিন। তবুও মানসিক স্বাস্থ্যের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হল অভ্যন্তরীণ সংঘাত থেকে মুক্তি, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গো মানিয়ে চলা এবং আত্ম সংযম। যাই হোক বহুমুখী চরিত্রের বিচারে মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ পরিমাপক নিরূপণ করা দুরূহ কাজ।

মানসিক স্বাস্থ্য নিরূপিত হতে পারে — (১) পূর্ব অভিজ্ঞতা সমূহ স্মরণে আনার দক্ষতার মাধ্যমে, (২) যে কোনো ঘটনা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতায়, (৩) জ্ঞানকে যথাযথ প্রয়োগ করার যোগ্যতায়, (৪) আবেগ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করার ক্ষমতায়।

সামাজিক স্বাস্থ্য ঃ

যে কোনো ব্যক্তির সামাজিক স্বাস্থ্য নিরূপণের ভিত্তি হল — (ক) আত্মমর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস, (খ) সামাজিক কার্যাদিতে অংশগ্রহণ, (গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (ঘ) অপরের জন্য চিন্তাভাবনা, (ঙ) অপরের সঙ্গো যোগাযোগ স্থাপন এবং মেলামেশা করার ক্ষমতা।

স্বাস্থ্যের নির্ধারক

স্বাস্থ্যকে এমন একটি গতিশীল ধারণা হিসাবে গণ্য করা হয় যার ব্যাপ্তি সুস্বাস্থ্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এত বিস্তারিত ও পরিবর্তনশীল যে কখনই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্য নির্ধারণের উপাদানগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিন্যস্ত — (১) মানবদেহের শারীরতত্ত্ব যার মধ্যে রয়েছে বংশগতির গঠন, (২) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ, (৩) স্বাস্থ্যবিধি, অভ্যাস এবং আচরণসহ জীবনযাপন পদ্ধতি, (৪) আর্থ-সামাজিক অবস্থান (শিক্ষা, বৃত্তি এবং আয়ের সমন্বয়), (৫) পুষ্টি (খাদ্যের প্রকৃতি এবং প্রাপ্তি, খাদ্য গ্রহণ), (৬) বাসস্থান, (৭) পরিস্রুত জল, (৮) স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্ক সচেতনতা, (৯) সামাজিক অবস্থা যথা — সুযোগের সমতা, (১০) সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সমূহ (তাদের লভ্যতা, নাগালের মধ্যে থাকা, ক্রয়ক্ষমতা যা সমাজ নির্ধারণ করে)।

স্বাস্থ্যের নির্দেশক

স্বাস্থ্য একটি সামগ্রিক ধারণা যার কেবলমাত্র শারীরিক দিকগুলি এই আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে কারণ এগুলি বেশি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর। মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্য তৃতীয় অধ্যায়ে স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যের নির্দেশককে দুটি বিভাগে ভাগ করা যায় — (ক) ব্যক্তিগত এবং (খ) সম্মিলিত।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের নির্দেশকগুলি হল — (১) অসুস্থতার হার, (২) প্রত্যাশিত জীবনকাল, (৩) কর্মদক্ষতা।

সম্মিলিত স্বাস্থ্যের নির্দেশকগুলি হল — (১) অপরিশীলিত জন্মহার, (২) অপরিশীলিত মৃত্যুহার, (৩) শিশু মৃত্যুহার, (৪) প্রসূতি মৃত্যুহার।

স্বাস্থ্য পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একগুচ্ছ নির্দেশকের। বর্তমানে স্বাস্থ্যকে ইতিবাচক ধারণা হিসাবে দেখা হয়, যদিও স্বাস্থ্য পরিমাপের অধিকাংশ নির্দেশকই নেতিবাচক যথা রুগ্নতা এবং দুর্বল স্বাস্থ্য। সুতরাং স্বাস্থ্যকে নিরূপণ করা যায় একগুচ্ছ নমনীয় নির্দেশকের মাধ্যমে। এই সকল নির্দেশককে হতে হবে --- (ক) সংবেদনশীল, (খ) নির্দিষ্ট, (গ) নৈর্ব্যক্তিক।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত স্বাস্থ্য নির্দেশকগুলি নিচে আলোচিত হল —

(১) মৃত্যুহার সূচক --- (ক) অপরিশীলিত মৃত্যু হার, (খ) জন্মকালে এবং একবছর বয়সে প্রত্যাশিত জীবনকাল, (গ) নবজাতকের মৃত্যুহার, (ঘ) শিশু মৃত্যুহার, (ঙ) প্রসূতি মৃত্যুহার, (চ) বিশেষ রোগজনিত মৃত্যু, (ছ) আনুপাতিক মৃত্যু হার।

মৃত্যুহারের সূচকগুলি শুধুমাত্র চরম পরিণতিকেই পরিমাপ করে, সমাজে অসুস্থতার বোঝার পরিমাণ প্রতিফলিত করে না।

(২) অসুস্থতার সূচক — (ক) রোগ প্রকোপের হার, (খ) বিভিন্ন অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধকতার ব্যাপকতা।

রোগ প্রকোপের হার নির্ণয় করা হয় কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে নতুনভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে ঐ রোগের ঝুঁকির সম্মুখীন জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে।

$$\text{অন্যভাবে এই হার হল} = \frac{\text{নতুনভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনা।}}{\text{ঐ রোগের ঝুঁকির সম্মুখীন জনসংখ্যা।}}$$

রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহের কার্যকারিতার মূল্যায়নের জন্য এবং ঐ সমাজে একটি রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নির্ণয়ের জন্যই এটি ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন রোগের প্রকোপের হার নির্ণয় করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালে অথবা কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাধিতে আক্রান্ত মোট মানুষের সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যার অনুপাত হিসেবে।

$$\text{রোগ প্রকোপের হার} = \frac{\text{রোগে আক্রান্ত (পুরনো ও নতুন) মানুষ}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

রোগের প্রকোপ হার রোগের বিস্তার ও প্রকার পরিমাপ করতে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলির পরিকল্পনা ও প্রয়োগে সহায়ক হয়।

গত তিন দশকে মৃত্যুহার অর্ধাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে যদিও দেশের মধ্যে মৃত্যুহারের বিপুল বিভিন্নতা বর্তমান যা প্রতি হাজারে ৫.৯ থেকে ১১.৮। মৃত্যুর প্রধান কারণগুলিকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ মৃত্যু ঘটে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির জন্য যেমন শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, আন্ত্রিক অসুস্থতা এবং তজ্জনিত জ্বর। কিন্তু বর্তমানে এটাও দেখা যাচ্ছে যে সংক্রামক ব্যাধিগুলি ছাড়াও অন্য কারণে মৃত্যু বাড়ছে। যেমন ক্যান্সার বা কর্কট রোগ, হৃদযন্ত্রজনিত রোগ, বিপাক বিশৃঙ্খলাজনিত রোগ এবং দুর্ঘটনা।

৩। পুষ্টি পরিষেবার নির্ধারকসমূহ

স্বাস্থ্যের প্রধান নির্ধারক হল পুষ্টি, বিশেষত জীবন গঠনের প্রথম কয়েক বছরে। পুষ্টির মান নির্ধারণ করা হয় কতকগুলি পদ্ধতির সাহায্যে যেমন —

(ক) জন্মকালে ওজন,
(খ) বয়স অনুযায়ী ওজন,
(গ) বয়স অনুযায়ী উচ্চতা,
(ঘ) উচ্চতা অনুযায়ী ওজন,
(ঙ) মধ্যবাহুর বেড় এবং
(চ) ত্বক আস্তরণের উৎকর্ষ।

৪। স্বাস্থ্য পরিষেবা নির্বাহের নির্ধারক

(ক) জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা,
(খ) চিকিৎসক ও নার্সের আনুপাতিক হার,
(গ) জনসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা,
(ঘ) জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং
(ঙ) প্রচলিত ধাত্রী পিছু জন সংখ্যা।

৫। সদ্ব্যবহারের হার

২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে স্বাস্থ্য পরিষেবা তার গুণগত মানোন্নয়ন ও সংখ্যাগত বিস্তার নিয়ে সহজলভ্য, মানসিকতায় গ্রহণযোগ্য এবং আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে হওয়া

উচিত। সমাজ এই পরিষেবা কতটা ব্যবহার করছে তা নির্ধারিত হয় উপরের ব্যবস্থাগুলি কি মাত্রায় করা হয়েছে তার উপর। বিভিন্ন পরিষেবার সদ্ব্যবহারের হার প্রয়োজন ও চাহিদা নির্দেশ করে এবং তার দ্বারা স্বাস্থ্যের অবস্থা বোঝায়। এই হারগুলি হল —

(ক) ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, পারটুসিস, পোলিও মাইলেটিস, যক্ষ্মা, হাম প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধে দু বছরের কম বয়সী শিশুদের টিকাকরণের হার,

(খ) মহিলাদের প্রাক-প্রসব পরিষেবা গ্রহণের শতকরা হার,

(গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব করানোর শতকরা হার,

(ঘ) হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা পূর্ণ হবার হার এবং

(ঙ) হাসপাতালে থাকার গড় সময়।

৬। মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক হার

(ক) বিবিধ প্রকৃতির মানসিক অসুস্থতা যথা বিষন্নতা, হিংস্র আক্রমণমুখী আচরণ, অস্বাভাবিক ব্যবহার,

(খ) আত্মহত্যার হার,

(গ) অপরাধের হার।

৭। সামাজিক স্বাস্থ্যের সূচক

(ক) সামাজিক অস্থিরতার ঘটনা,

(খ) অপরাধমূলক ঘটনা,

(গ) নিরক্ষরতা ও শিক্ষাহীনতা,

(ঘ) মানুষে মানুষে বৈষম্য,

(ঙ) সামাজিক অস্থিরতা,

(চ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,

(ছ) মহিলাদের ক্ষমতা ও নারীর মর্যাদা।

ভারতের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিস্থিতি

আমাদের সংবিধানে নির্দেশিত সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন করেছে যেখানে স্বাস্থ্যকে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধারাবাহিক চেষ্টার মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। পরিবর্তিত বৃহত্তর প্রেক্ষিতে মৃত্যুহারও অর্ধেকের নীচে নেমে গেছে (১৯৫১ সালে হাজার পিছু ২৭.৪ থেকে ১৯৯৯ সালে হাজার পিছু ৮.৭)। হাজার প্রতি শিশু জন্মের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ১৯৭৩ সালে ১৩৫ থেকে ১৯৯৮ সালে ৭২ এবং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৩২ বছর থেকে বেড়ে ৬০ বছরের ওপরে দাঁড়িয়েছে।

যদিও এই সাফল্যগুলি সামান্য নয়, তবু এ থেকে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের মান এখনও গভীর উদ্বেগের বিষয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদিও ক্রমহ্রাসের দিকে তবুও প্রসূতি মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার যথেষ্ট বেশী।

মাথা পিছু ক্যালোরি গ্রহণ সুপারিশকৃত মাত্রায় না থাকার ফলে চরম অপুষ্টি ঘটে, বিশেষত অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এবং সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে। দৃষ্টিহীনতা, যক্ষ্মা এবং রক্তাল্পতার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। গ্রামীণ জনগণের মাত্র এক তৃতীয়াংশ নিরাপদ পানীয় জল পায় যেটা জলবাহিত সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন। এই রোগগুলি থেকে অর্ধেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মাত্র ০.৫ শতাংশ মানুষ মৌল স্বাস্থ্য বিধান সম্মত সুবিধাগুলি গ্রহণে সমর্থ হন।

যদিও ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধন ঘটেছে, তথাপি এ দেশের জনগণকে অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সংক্রামক রোগ আজও স্বাস্থ্যহীনতার গুরুতর কারণ। অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমবর্ধমান। পুষ্টিহীনতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। একদিকে প্রবল অর্থ ও সঙ্গতির অভাব এবং অপরদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার অসম বন্টন।

স্বাস্থ্য সমস্যার প্রধান কারণগুলি হ'ল নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, জনসংখ্যার ব্যাপকতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অসম বন্টন। তদুপরি জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে শোচনীয় ক'রে তুলছে।

শিশু এবং প্রসূতি মৃত্যুহার

জনগণের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ হ'ল শিশুরা এবং সন্তান ধারণের বয়সের মহিলারা। যদিও শিশু মৃত্যুহার ক্রমশ হ্রাসমান তবু এখনও তা বেশীই আছে। শিশু মৃত্যুহার একটি সংবেদনশীল বিষয় যা শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্যের মান নির্দেশ করে না; শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পুষ্টি ইত্যাদির নিরিখে মানব উন্নয়নের স্তরকেও সূচিত করে। ভারতবর্ষে সাম্প্রতিককালে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের গতি পেয়েছে তথাপি অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আজও বেশী, এমনকি এশিয়া মহাদেশের কিছু কিছু দেশে এটি কম। ২০০১ সালে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু হার শ্রীলঙ্কায় ছিল ১৭ যেখানে থাইল্যান্ড, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এই হার যথাক্রমে ২৪, ৩১ এবং ৩৩ (ইউ. এন. ডি. পি.র মানব উন্নয়ন সূচকের প্রতিবেদন, ২০০৩)। ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুহার এক বছর বয়স পর্যন্ত ৭২ এবং শিশুর চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে এই হার ৯৩ (ইউ. এন. ডি. পি., ২০০৩)।

অর্থাৎ পাঁচবছর বয়ঃ ক্রমের পূর্বেই প্রায় এক দশমাংশ শিশুর মৃত্যু ঘটে। বিপুল সংখ্যক শিশুর তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত রোগে এবং প্রায় ১৩ লক্ষ শিশুর টিকাকরণ না হওয়ার জন্য প্রতিরোধযোগ্য রোগগুলিতে মৃত্যু ঘটে, যেমন নবজাতকের ধনুষ্টংকার এবং হাম। মৃত্যুর অন্তর্নিহিত প্রধান কারণ অপুষ্টি, মৃত্যুহার দ্বিগুণ হয় নিম্নমানের পুষ্টির প্রতিটি স্তরেই।

সারণি - ৫.২

ভারতবর্ষে উচ্চ শিশু মৃত্যু হারের প্রধান কারণ সমূহ

নবজাত শিশু মৃত্যু হার (০-৪ সপ্তাহে)	শিশু মৃত্যু হার (১-১২ মাসে)
• অপরিণত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া • জন্মের সময় কম ওজন	• আন্ত্রিক এবং অন্যান্য উদরাময় রোগগুলি • তীব্র শ্বাসজনিত সংক্রমণ

নবজাত শিশু মৃত্যু হার (০-৪ সপ্তাহে)	শিশু মৃত্যু হার (১-১২ মাসে)
• প্রসবকালীন আঘাত • উদরাময় রোগগুলি • তীব্র শ্বাসজনিত সংক্রমণ • জন্মকালীন অস্বাভাবিকতা • রক্তক্ষরণকারী রোগ	• সংক্রামক ব্যাধিগুলি (যেমন হুপিং কাশি) • অপুষ্টি • জন্মকালীন অসঙ্গতি

যে যে কারণের ফলে শিশুমৃত্যু হার কমে আসছে তার মধ্যে আছে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি, সংক্রামক ব্যাধিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, উন্নততর পুষ্টি, প্রসবকালীন যত্ন, টিকা দানের সাহায্যে প্রতিরোধযোগ্য রোগগুলির ক্ষেত্রে টিকাকরণ এবং জনগণের মধ্যে অধিকতর স্বাস্থ্য সচেতনতা। বেশীর ভাগ শিশুমৃত্যুর উৎসগুলি চিকিৎসাসাধ্য এবং প্রতিরোধযোগ্য।

যে প্রত্যক্ষ কারণগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে সেগুলি ছাড়াও অধিক শিশু মৃত্যুর পেছনে আছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ। এগুলি হল অল্প বয়সে মা হওয়া, দুটি সন্তানের জন্মের মধ্যে স্বল্প ব্যবধান, অধিক সন্তানের জন্মদান, পরিবারের বৃহৎ আকার, অস্বাস্থ্যকর শিশু প্রতিপালন অভ্যাস, পরিবারের স্বল্প আয়, প্রাক্ জন্ম এবং জন্মোত্তর পরিষেবার অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন ধাত্রীদের দ্বারা প্রসব এবং সর্বোপরি নিম্নমানের পরিবেশ।

এই কারণগুলির অধিকাংশই দূর করা সম্ভব যদি মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের মাধ্যমে সময়মতো দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে বেছে নিয়ে যথাযথ উন্নততর পরিষেবার ব্যবস্থা করা যায়। যেখানে প্রসূতির মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫ থেকে ১০ এর মধ্যে থাকে, জীবিত সন্তানের জন্ম বেশ বেশি। দেশের মোট মৃত্যুর ১ শতাংশের বেশী প্রসূতির মৃত্যু ঘটে এবং মহিলাদের মৃত্যুর শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ ঘটে প্রসূতিদের।

পৃথিবীর মোট প্রসূতি মৃত্যুর শতকরা ২০ ভাগ ঘটে ভারতবর্ষেই। প্রসূতি মৃত্যুর আনুপাতিক হার (প্রতি লক্ষ জীবিত সন্তানের জন্মের মধ্যে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা হিসাবে) অবিশ্বাস্যভাবে বেশি, প্রতি লক্ষ জন্মের মধ্যে ৪০৮ জন যা এশিয়ার কিছু দেশের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। চীন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানে প্রসূতি মৃত্যুহার যথাক্রমে ৬০, ৬০, ৪৪ এবং ২০০ (২০০২ সালের বিশ্ব জনসংখ্যার প্রতিবেদন অনুসারে)। ভারতের আন্তঃরাজ্য বৈচিত্র্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (ভারত সরকার, ২০০০)।

প্রসূতি মৃত্যুর উচ্চ হারের প্রধান কারণসমূহ গর্ভকালীন অসুস্থতা যথা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, বিষক্রিয়া এবং পচন (পিউয়েপেরাল সেপসিস) ইত্যাদি। শতকরা ২০ ভাগ প্রসূতির মৃত্যু সরাসরি ঘটে গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা-জনিত জটিলতার কারণে এবং এটি পরোক্ষভাবে আরও শতকরা ২০ ভাগ প্রসূতির মৃত্যুর জন্য দায়ী।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষে প্রসূতি সম্বন্ধীয় কারণে নারীদের মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রায় ৫০ গুণ বেশি। ভারতীয় নারীদের উপর পুত্র সন্তান লাভের জন্য প্রচণ্ড চাপের ফলে বারংবার তাদের গর্ভবতী হতে হয় যা প্রসূতিকালীন মৃত্যুর বড় কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে মোট প্রসূতি মৃত্যুর প্রায় ৭২ শতাংশ প্রাক্-প্রসব এবং উন্নততর সুযোগ সুবিধার দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

NFHS-2 সমীক্ষার হিসাবে প্রতি লক্ষে প্রসূতি মৃত্যু ৪৩৭। এ বিষয়ে গ্রাম-শহরের মধ্যে পার্থক্য আছে, গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যা ৪৪৮ এবং শহরাঞ্চলে ৩৯৭। যে সমস্ত অঞ্চলে সন্তান উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশি এবং যে সমস্ত রাজ্যে খুব অল্প বয়সী মেয়েরা সন্তান ধারণ করে সে সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক।

সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগগুলিও ভারতের জনগণের সামনে বড় বিপদ। সংক্রামক রোগগুলি হল — ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ডিপ্থেরিয়া, হুপিং কাশি, হাম, ধনুষ্টংকার, কলেরা, আন্ত্রিক ইত্যাদি।

অসংক্রামক ব্যাধিগুলি হল—হৃদ্‌যন্ত্র ঘটিত রোগ, মধুমেহ বা ডায়বেটিস, ক্যান্সার, অন্ধত্ব এবং দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণগুলিই জনগণের স্বাস্থ্যের মান এবং জীবন যাত্রার মানকে প্রভাবিত করে।

পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যার পরিবর্তন

পুষ্টিই স্বাস্থ্যের প্রধান নির্ধারক, বিশেষত জীবনের গড়ে ওঠার প্রথম কয়েকটি বছরে। এটি একগুচ্ছ প্রণালীর দ্বারা নিরূপিত হয়। এটি স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক উপাদান। পুষ্টিগত মান নির্ধারিত হয় কতকগুলি বিষয় দ্বারা। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটির একটি হল খাদ্যগ্রহণ এবং অপরটি রোগ সংক্রমণ।

অপুষ্টি ব্যক্তিকে দুর্বল স্বাস্থ্যের দিকে নিয়ে যায়, আবার এই স্বাস্থ্যহীনতা পুষ্টির মানকে বিঘ্নিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে অপুষ্টি ব্যাপক এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। এটি জনগণের অনেকাংশকে সমস্যায় ফেলে-বিশেষত মহিলা এবং শিশুদের।

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সমস্ত পুষ্টিকর দ্রব্যের প্রয়োজন তা খাদ্য থেকেই আসে — প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থসমূহ। সাধারণ দৈনন্দিন খাদ্যের পরিমাণ এবং মানের ওপর নির্ভর করে যথেষ্ট পরিমাণে এবং সঙ্গত অনুপাতে পুষ্টি গ্রহণ হচ্ছে কিনা। জনগণের বৃহৎ অংশের কম পরিমাণে খাদ্যগ্রহণের অনেকগুলি কারণ আছে। পারিবারিক আয় এবং পরিবারের আয়তন দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরা তাদের নাগালের মধ্যে খাদ্যের পরিমাণ এবং ধরন ঠিক করে দেয়।

আহার্য গ্রহণ

আগে অপুষ্টিকে জাতীয় স্তরে সর্বপ্রধান খাদ্য সমস্যা হিসাবে ধরা হত এবং এটা ধরে নেওয়া হত যে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে অপুষ্টি সমস্যাকে রোধ করা সম্ভব। এখন এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে যদিও জাতীয় স্তরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের একটি পূর্ব শর্ত, তবু এটাই যথেষ্ট নয়, কারণ একটি পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যগ্রহণ তার ক্রয় ক্ষমতা দিয়ে নির্ধারিত হয়, এমনকি মাথাপিছু খাদ্যের যোগান বেড়ে গেলেও।

ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এই উন্নতিকে অনেকটাই ব্যাহত করেছে। খাদ্যের বিষয়ে ধারণা এবং সংস্কারও খাদ্য নির্বাচনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং কিছু কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবহারকে সীমিত করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইসব অভ্যাস দেখা যায় দরিদ্র জনগণের মধ্যে। ফলস্বরূপ অপুষ্ট জননীরা অল্প ওজন বিশিষ্ট শিশুদের জন্ম দেয় এবং নবজাত ও শিশুদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।

নবজাত এবং শিশুদের প্রকৃত খাদ্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে মায়েদের জ্ঞানের অভাবই পর্যাপ্ত খাদ্য না পাবার অপর কারণ। উদাহরণ স্বরূপ, নবজাত এবং শিশুদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্টিলাভ এবং এক প্রস্থ রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মাতৃদুগ্ধ পানের অভ্যাস বাড়াতে হবে এবং তাকে সমর্থন করতে হবে। যতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করছে ততদিন শিশুর আর অন্য কোন খাদ্যের প্রয়োজন নেই এই ভ্রান্ত ধারণা এবং পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রভৃতিও অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ। তাই খাদ্যগ্রহণ কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় যেমন ক্রয় ক্ষমতা, পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান, অসুস্থ অবস্থায় খাদ্য খাওয়ানোর রীতি ইত্যাদি। খাদ্যগ্রহণ ব্যক্তির পুষ্টিগত মানকে সরাসরি প্রভাবিত ক'রে এটি জনগণের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে যা জীবনের উৎকর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

অপুষ্টিপ্রবণ জনগোষ্ঠী

অপুষ্টি জনগণের সর্বাংশকেই আক্রমণ করে তবে স্বাস্থ্যের ওপর এর কুফলভোগের ঝুঁকি গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি জননী, গর্ভস্থ ভ্রূণ, নবজাত শিশু এবং প্রাক-বিদ্যালয় পর্যায়ের শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশী।

পুষ্টি অভাবগ্রস্ত মানুষদের সন্তান উৎপাদনের হার বেশী বলে সাধারণত মনে করা হয়। এই ধারণার বিপরীতে অপুষ্টির বিপরীত ফলও দেখা যায়। ভারতবর্ষে ১ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে লিঙ্গানুপাত হ্রাসের কারণ মহিলাদের উচ্চ মৃত্যুহার। আবার সন্তান ধারণের বয়সে লিঙ্গানুপাতিক হার হ্রাস পায় প্রসূতি মৃত্যুহার অধিকতর হওয়ার ফলে। উচ্চমৃত্যুহারের পেছনে অপুষ্টির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে যা আবার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পরিবারের আয়তন এবং পুষ্টি গ্রহণের মধ্যে ব্যস্তানুপাত সম্পর্ক আছে। শতকরা ৬০ ভাগের বেশি শিশু যারা প্রোটিন ও শক্তির অভাবে প্রচন্ডভাবে ভোগে তারা বৃহৎ পরিবারের সন্তান, যেখানে সন্তানের সংখ্যা চার অথবা তার চেয়েও বেশি (NCERT, 1991)।

জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

আর্থ-সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষাই হল চাবিকাঠি। এটি হল জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসহ নানাবিধ সচেতনতা সঞ্চারের জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মাধ্যম। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশিত ভূমিকা হল শিক্ষার্থীদের তথ্য যোগান দেওয়া, তাদের মধ্যে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করা যাতে তারা ছোট পরিবারের ধারণা ও উন্নততর পারিবারিক জীবনযাত্রা যাপন সম্পর্কে অবহিত ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা, বিশেষত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, একটি কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে। শিক্ষা এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্কটি হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার। শিক্ষা, বিবাহের বয়স, জন্ম এবং মৃত্যুহার প্রভৃতির মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মহিলা ও বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার নারীদের ক্ষমতায়নে ও বিবাহের বয়স পিছিয়ে দেওয়ায় সাহায্য করে যার ফলে শিশুদের বেঁচে থাকার হার বাড়ে এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার কমে।

আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার তাৎপর্য আরও বেশী কারণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগই তো তাঁরা। শিক্ষিত মহিলারা জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারেন কারণ এরা সন্তান হিসেবে সরাসরি তাঁদের আয়ত্তেই থাকে।

১৯৯৪ সালে একটি প্রবন্ধে এল সামারস্ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় সমীক্ষার সারাংশ করে জানান যে নিরক্ষর জননীদের ক্ষেত্রেই নবজাত শিশুর মৃত্যুহার বেশী এবং জননীদের শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মৃত্যুহারও হ্রাস পায়। এই তথ্য এটা বোঝায় না যে শিক্ষিত জননীরা তাঁদের শিশু সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করেন বরং তাঁদের স্বাস্থ্যভ্যাসের দিকে বেশী নজর থাকে যেমন নিরাপদ পানীয় জল, অধিকতর পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে আহার্য প্রস্তুত, মলমূত্র থেকে উদ্ভূত রোগাদির বিপদ বিষয়ে সচেতনতা, ম্যালেরিয়া বাহক মশার দংশনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা, টিকাকরণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ইত্যাদি। বালিকাদের পাঁচ বছরের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ প্রতি হাজার প্রসবের ক্ষেত্রে ১০টি মৃত্যুকে এড়াতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে সামারস্ অতিরিক্ত এক হাজার বালিকাকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যয়ের সঙ্গে জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাসের লক্ষ্যে সমান ফলপ্রাপ্তির জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনা করেছেন।

ভারতবর্ষে আরও এক হাজার বালিকাদের শিক্ষা দিলে নিম্নলিখিতগুলি এড়ানো যাবে —

- দুটি প্রসূতি মৃত্যু।
- ৪৩টি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু।
- ৩০০টি জন্ম।

এই কাজে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যয় করা প্রয়োজন ১লক্ষ ১০হাজার ডলার (বা ভারতীয় মুদ্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা)। পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ৩২ হাজার ডলার (বা ভারতীয় মুদ্রায় ১৬ লক্ষ টাকা)। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপেক্ষা শিক্ষা, বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের শিক্ষা, বেশী ফলদায়ী (ইউনেস্কো ১৯৯৬)। এইভাবে শিক্ষা উন্নততর স্বাস্থ্যলাভে, সন্তান উৎপাদন হ্রাসে এবং জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করে।

শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার স্বাস্থ্য পরিচর্যা

শিশুর জন্মদানের সময়, দুই শিশুর জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান, শিশু জন্মের মোট সংখ্যা এবং মায়ের প্রজনন স্বাস্থ্যের সঙ্গে শিশুর বেঁচে থাকার নিবিড় সম্পর্ক আছে। অল্পবয়সে বা বেশীবয়সে, স্বল্পকালের ব্যবধানে অনেক সংখ্যক শিশুর জন্মদান নবজাতকের এবং শিশুবয়সে বেশী মৃত্যুর বড় কারণ, বিশেষত যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব আছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যও শিশুর বেঁচে থাকা না থাকা ঠিক করে দেয়। অসুস্থতার সময় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম যত্ন করাটাও লক্ষ্য করা যায়। পরিবারে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি যত্নের পার্থক্যও বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ে ভর্তি, সাক্ষরতা দান, পেশাদারী প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায় যার ফলে পরবর্তী জীবনে জননীর গুণাবলীতে ঘাটতি দেখা দেয় এবং তার প্রভাব পড়ে শিশুর প্রতিপালন এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে।

স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় —

১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা,

২। দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা,

৩। তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা।

এখানে আমরা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করছি।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা

১৯৭৮ সালের Alma Ata (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ)-এর ঘোষণা অনুসারে "প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা হচ্ছে সেই অত্যাবশক স্বাস্থ্য পরিষেবা যা সব মানুষের নাগালের মধ্যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যা সকলের সম্পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তির সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা আমাদের দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি সমতা, সমাজের অংশগ্রহণ, আন্তর্বিভাগ সমন্বয় এবং যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অপরিহার্য উপাদানগুলি হল —

ক) প্রচলিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি এবং সেগুলি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার উপায় সম্পর্কে শিক্ষা,

খ) খাদ্য সরবরাহের এবং যথাযথ পুষ্টির যোগান বাড়ানো,

গ) পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং মৌলিক স্বাস্থ্য বিধান,

ঘ) পরিবার পরিকল্পনা সহ প্রসূতি এবং শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা,

ঙ) প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে টিকাকরণ,

চ) অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এমন ব্যাধিগুলির প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ,

ছ) সাধারণ ব্যাধি এবং ক্ষতাদির উপযুক্ত চিকিৎসা,

জ) অত্যাবশ্যক ঔষধগুলির সরবরাহ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যক্রম

মা ও শিশুর প্রতি যত্ন

১। প্রাক্ প্রসব যত্ন — গর্ভাবস্থায় একজন স্ত্রীলোকের যত্ন অবশ্যই নেওয়া উচিত যাতে গর্ভাবস্থার শেষে একজন সুস্থ জননী একটি সুস্থ সন্তান লাভ করতে পারেন। একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভকালীন অবস্থার প্রথম থেকেই চিকিৎসা কেন্দ্রে অথবা একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ও পরামর্শ করা প্রয়োজন। সন্তানসম্ভবা মাকে প্রথম দেখার সময় চিকিৎসক ঐ মহিলার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত লিখে নেবেন এবং শারীরিক পরীক্ষা করবেন। এছাড়া ল্যাবরেটরীতে মল, মূত্র পরীক্ষা করাবেন এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা প্রভৃতি দেখে নেবেন। পরের বার দেখার সময় মূত্র পরীক্ষা ও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সহ ওজন বৃদ্ধি, রক্তচাপ মেপে দেখবেন। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী গর্ভবতীকে ধনুষ্টংকার প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে। বহু গর্ভবতী স্ত্রীলোক রক্তাল্পতায় এবং 'এ' ও 'বি' ভিটামিনের ঘাটতিতে ভোগেন। চিকিৎসক এঁদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেবেন। গর্ভবতী মহিলাদের সুষম এবং পর্যাপ্ত আহার গ্রহণ করা উচিত, কারণ তাঁদের অনেকটা অতিরিক্ত ক্যালরি এবং পুষ্টির প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও তাঁদের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সুনিদ্রা এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। কোষ্ঠকাঠিন্য পরিহার করার জন্য তাঁদের শাকপাতা ও তরকারী এবং বেশী করে জল ও অনুরূপ পানীয় পান করা উচিত। হাল্কা ব্যায়াম, যেমন সাধারণ গৃহকাজ, করা ভাল। কঠোর দৈহিক পরিশ্রম তাদের অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে।

যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন তার ভ্রূণ রজ্জু (Umbilical Cord) অবশ্যই জন্মের সাত দিনের মধ্যে পড়ে যাওয়া উচিত। এতে কোনো তেল জাতীয় জিনিষ লাগানো ঠিক নয়। প্রসব অবশ্যই যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত।

২। **প্রসবোত্তর যত্ন** — প্রসবোত্তর যত্ন বলতে প্রসবের পর নবজাত শিশু এবং জননীর যত্ন বোঝায়। প্রসবের পর নানারকম প্রসবোত্তর সমস্যাদি দেখা দিতে পারে। এগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসকের কাছে মাকে প্রসবোত্তরকালীন পরীক্ষা অবশ্যই করাতে হবে। রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে হিমোগ্লোবিনের মাত্রার পরীক্ষা করতে হবে এবং রক্তাল্পতার চিকিৎসা করাতে হবে। মাকে সুষম এবং পর্যাপ্ত আহার দিতে হবে। তাঁকে অবশ্যই উন্নত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে এবং তাঁর শারীরিক সৌষ্ঠব পুনরুদ্ধারের জন্য পরিমিত ব্যায়াম করতে হবে। নিরুদ্বেগ বিশ্রাম তাঁর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

৩। **নবজাত শিশুকে খাওয়ানো** — যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে জননীর প্রথম স্তন্য দুগ্ধ অবশ্যই পান করাতে হবে কারণ এই দুগ্ধ (কোলোস্ট্রাম বা ক্ষরিত রসধারা) নবজাত শিশুর নানা রোগের প্রতিষেধকরূপে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। অন্ততপক্ষে চার থেকে পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ নবজাত শিশুর পক্ষে আদর্শ খাদ্য কারণ শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকারের পুষ্টিই মাতৃদুগ্ধে থাকে। শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধ নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত এবং যথাযথ উষ্ণতায় এর মধ্যে জীবাণুর প্রতিরোধক উপাদান আছে যা অনেক ব্যাধি থেকে নবজাত শিশুকে রক্ষা করে।

মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ মাতৃত্ব

উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক অংশে নারীদের সন্তান উৎপাদনের বয়সকালে গর্ভাবস্থা এবং সন্তানদের জন্মদান সম্বন্ধীয় নানা প্রকার জটিলতা প্রসূতি মৃত্যুহারের মুখ্য কারণগুলির অন্যতম। বিশ্ব পর্যায়ে নিরূপিত হয়েছে যে প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ নারীর মৃত্যু ঘটে গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত জটিলতায় এবং তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রসূতি মৃত্যুহারের বিরাট ব্যবধান আছে। বিশ্ব জনস্বাস্থ্য সংস্থা অনুসারে কয়েকটি উন্নত দেশের ক্ষেত্রে প্রতি দশ হাজারে ১টির তুলনায় স্বল্প উন্নত দেশগুলিতে গর্ভাবস্থা জনিত কারণে অথবা প্রসবকালীন মৃত্যুর ঝুঁকি প্রতি ২০টির ক্ষেত্রে ১টি।

নারীদের সন্তান ধারণ শুরু অথবা শেষের বয়স, প্রতিটি জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান, সারা জীবনের মোট গর্ভধারণ সংখ্যা, সামাজিক - সাংস্কৃতিক ও আর্থিক অবস্থাদি যার মধ্যে তাঁরা বেঁচে আছেন, এ সমস্তই অসুস্থতা এবং মৃত্যুকে প্রভাবিত করে। বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ নারীদের জীবনরক্ষার জন্য বিভিন্ন আইনসঙ্গত শর্তে গর্ভপাত অনুমোদনের নীতি গ্রহণ করেছে। তথাপি গর্ভপাতের এক উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পন্ন হয় স্ব-প্রবৃত্ত অথবা বিপজ্জনক ভাবে যার ফলে অনেক প্রসূতির মৃত্যু ঘটে অথবা সংশ্লিষ্ট মায়ের স্থায়ী ক্ষতি হয়। শিশুদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে মায়ের অপরিহার্য ভূমিকার নিরিখে পরিবারের ক্ষেত্রে প্রসূতি মৃত্যুর পরিণাম গুরুতর। মায়ের মৃত্যু তাঁর নাবালক শিশুদের বেঁচে থাকার বিপদ বাড়িয়ে তোলে বিশেষত যে পরিবারে মায়ের ভূমিকার বিকল্পের কোন সংস্থান থাকে না। অল্পবয়সী মেয়েদের এবং তরুণীদের ক্ষেত্রে প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার এবং বিপজ্জনক গর্ভপাত বন্ধ করে প্রসূতিকালীন অসুস্থতা এবং মৃত্যুর একটি বড় অংশকে প্রতিরোধ করতে পারে। অনেক দেশে নিরাপদ মাতৃত্বকে প্রসূতি কালীন অসুস্থতা এবং মৃত্যু হ্রাসের মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ICPD-এর কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত দেশগুলির ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসূতি মৃত্যু উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। প্রসূতি মৃত্যু ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০০ সালের মধ্যে অর্ধেক এবং ২০১৫ সাল নাগাদ বাকী অর্ধেক কমাতে হবে।

১৯৯০ সালে দেশগুলিতে প্রসূতি মৃত্যুর স্তরের বিভিন্নতা অনুসারে এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। যে সব দেশে এই মৃত্যুর সংখ্যা মাঝারি স্তরে, তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ২০০৫ সালে প্রতি লক্ষ জন্মের ক্ষেত্রে প্রসূতি মৃত্যুহার ১০০-রও নিচে এবং ২০১৫ সালে প্রসূতি মৃত্যুহার প্রতি লক্ষ জন্মের ক্ষেত্রে ৬০-এর নিচে নামিয়ে আনা। যে সমস্ত দেশের মৃত্যুর স্তর সর্বোচ্চ, তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ২০০৫ সালে প্রসূতি মৃত্যুহার প্রতি লক্ষ জন্মের ক্ষেত্রে ১২৫-এর নিচে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসূতি অসুস্থতা এবং মৃত্যু এমন জায়গায় নামিয়ে আনা যাতে এটি আর জনস্বাস্থ্যের সমস্যা বলে গণ্য হবে না।

দেশের ভেতরে বিভিন্নতা এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং নৃতত্ত্বগত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে। সুতরাং সব দেশগুলির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গে প্রসূতি স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো অবশ্যই উচিত। অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই পরিষেবা-সমূহের মধ্যে থাকবে নিরাপদ মাতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা, প্রাক্-প্রসব যত্ন, প্রসূতির পুষ্টি কর্মসূচী, যথেষ্ট প্রসবকালীন সহায়তা যা শল্য চিকিৎসার সাহায্য এড়াতে পারবে এবং জরুরীকালীন ধাত্রীর সুযোগ দান, শিশুর জন্ম এবং গর্ভপাতজনিত জটিলতার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে প্রসবোত্তর যত্ন ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। জননীর স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচির অংশ হিসাবে যুবতী নারীদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তরুণ-তরুণীদের তথ্য, শিক্ষা এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা উচিত যাতে তারা পরিবার গঠন, অল্প বয়সে যৌন ক্রিয়া এবং গর্ভধারণ বিলম্বিত করতে পারে। কোন কারণেই গর্ভপাতকে পরিবার পরিকল্পনার উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা ঠিক নয়। জনস্বাস্থ্যের অন্যতম মুখ্য বিষয় হিসাবে গর্ভপাতের মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাকে নারী স্বাস্থ্যের বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকতে হবে এবং সম্প্রসারিত ও উন্নত পরিবার পরিকল্পনার সাহায্যে বিপজ্জনক গর্ভপাতের শরণ নেওয়া কমাবার জন্য কাজ করতে হবে। অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ প্রতিরোধকেই সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া উচিত এবং গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা দূর করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা করা উচিত। অবাঞ্ছিত গর্ভধারিণীদের নির্ভরযোগ্য তথ্যলাভের এবং সহৃদয় পরামর্শ লাভের সহজ সুযোগ দেওয়া উচিত (ইউ. এন.এফ.পি.এ., ১৯৯৬)।

স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ নীতিসমূহ

আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গঠিত কতকগুলি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার নীতি ও কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার আয়োজন মূলত ১৯৮৩ সালে সংসদ অনুমোদিত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও ১৯৮৩ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ সালের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত্ত করার ওপরেই প্রধানত জোর দিয়েছে, তবু বিশেষভাবে নজর দেওয়ার মত কতকগুলি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল - ক) জনসংখ্যার সর্বাংশের জন্য পুষ্টি, খ) টিকাকরণ কর্মসূচী, গ) প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, ঘ) খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ এবং ঔষধপত্রাদির মান বজায় রাখা, ঙ) জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধান, চ) পরিবেশের সুরক্ষা, ছ) বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য কর্মসূচী, জ) বৃত্তি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, এবং ঝ) স্থানীয় ভাবে ছড়িয়ে

পড়া ব্যাধি সমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ। এই সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্থক প্রয়োগে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী প্রক্রিয়ার অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয়।

১৯৭৮ সালের Alma Ata ঘোষণায় স্বাক্ষর করার পর, ভারত ২০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই লক্ষ্যে দেশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। গ্রামীণ জনসাধারণ যাঁরা প্রধানত অবহেলিত ছিলেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যই এটা করা হয়। প্রসূতি এবং শিশু স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সহ পরিবার কল্যাণ পরিষেবা দেওয়া হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, বিভাগীয় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও গ্রাম্য স্তরের পরম্পরাগত জন্ম সময়ে উপস্থিত সেবা কর্মীগণের সাহায্যে। বর্তমান পরিকাঠামো অনুসারে প্রতি ৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি উপকেন্দ্র, প্রতি ২০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। শহর এবং নগরাঞ্চলের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ পরিষেবা সরকারী অথবা পৌর হাসপাতাল এবং ঔষধালয় ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে এই পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারী হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ঔষধালয়গুলিরও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

ভারতই প্রথম দেশ যেখানে ১৯৫২ সালে একটি সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার আগেও এই লক্ষ্যে কিছু কিছু বেসরকারী কাজ হয়েছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে পরিবার পরিকল্পনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনায় বর্তমানে অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হল পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে মানুষের জ্ঞান, মানসিকতা ও আচরণে পরিবর্তন সাধন। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচিকে প্রসূতির স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কর্মসূচী দু'টি সন্তান সম্বলিত ছোট পরিবার (পুত্র কন্যা নির্বিশেষে) সম্পর্কে পিতা-মাতাকে দায়িত্বশীল ক'রে তোলে। এজন্য স্বেচ্ছায় গর্ভ-নিরোধক পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে এবং প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য অভিমুখী প্রকল্প প্রবর্তন করে। শিক্ষা এবং সঞ্চালনার মাধ্যমে জনগণের কাছে ছোট পরিবারের বার্তা নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষা ও প্রেরণামুখী চেষ্টার সাহায্যে গণমাধ্যমের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম পরিবার পরিকল্পনার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই ব্যাপারে সাংস্কৃতিক-সামাজিক বাধা দূর করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি

২০০০ সালে ভারত সরকারের অনুমোদিত জাতীয় জনসংখ্যা নীতি তার লক্ষ্যগুলির এক মৌলিক পরিবর্তন আনে। পরস্পর সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলি জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে এই দলিলে প্রতিফলিত হয়। এতে বলা হয়েছে এই সহস্রাব্দে রাষ্ট্রগুলির মূল্যায়ন হবে নিম্নলিখিত মাপকাঠিগুলি দিয়ে - তার জনগণের সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার স্তর, নাগরিকরা কতখানি সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেন, শিশুদের রক্ষার নিশ্চয়তা এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা। ভারতের বিরাট জনসংখ্যা তার কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে যদি তারা সুস্থ এবং আর্থিকভাবে উৎপাদনশীল জীবন যাপনের সুযোগ পায়।

এই দলিলে শুধু জনতত্ত্ব সংক্রান্ত লক্ষ্যই নয়, এটি জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা অর্জন করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সামাজিক উদ্দেশ্যগুলিকেও বিবেচনা করেছে (ভারত সরকার ২০০০)।

সারণি - ৫.৩

২০১০ সালের জন্য জাতীয় সামাজিক জনতত্ত্বের লক্ষ্য সমূহ

১) মৌলিক প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা ও মৌলিক পরিকাঠামো তৈরীর যে অভাবগুলি দূর হয়নি সেগুলির প্রতি নজর দেওয়া।

২) ১৪ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে বালক-বালিকাদের উভয় ক্ষেত্রে স্কুলছুট শতকরা কুড়িভাগের নিচে নামিয়ে আনা।

৩) প্রতি ১০০০ সপ্রাণ নবজাতকের জন্মের মধ্যে মৃত্যুহার ৩০ -এর নীচে নামিয়ে আনা।

৪) প্রতি ১ লক্ষ সপ্রাণ প্রসবের ক্ষেত্রে প্রসূতি মৃত্যু অনুপাত ১০০-এর নীচে নামিয়ে আনা।

৫) টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য সমস্ত রোগের বিরুধ্বে শিশুদের সর্বজনীন ভাবে টিকাদানের কাজ সম্পন্ন করা।

৬) মেয়েদের বিয়ে ১৮ বছরের আগে নয় এবং ২০ বছরের পরে হওয়াই ভাল — এই মর্মে সকলকে উৎসাহিত করা।

৭) শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসব এবং ১০০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রসবের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

৮) সন্তান উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য, পরামর্শ, পরিষেবা এবং একগুচ্ছ গর্ভ নিরোধক থেকে পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেবার সুযোগ সকলের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা।

৯) শতকরা ১০০ ভাগ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং গর্ভধারণ নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা।

১০) এইড্স রোগের বিস্তার রোধ করা এবং গর্ভনালীতে সংক্রমণের ও যৌন সংসর্গের দ্বারা সংক্রমণের সম্পর্কে ব্যবস্থা এবং জাতীয় এইডস্ নিয়ন্ত্রণ সংগঠন-এর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন।

১১) সংক্রামক ব্যাধিগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ।

১২) ভারতে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

১৩) ছোট পরিবারের ধারণাকে জোরদারভাবে এগিয়ে নেওয়া।

১৪) পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ক্ষেত্রের কর্মসূচীগুলির রূপায়ণ যুগপৎ করা যাতে পরিবার কল্যাণ জনমুখী প্রকল্পে পরিণত হয়।

(উৎস ঃ জাতীয় জনসংখা নীতি ২০০০, ভারত সরকার, নয়াদিল্লী)

জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ -এর কিছু লক্ষ্যের পুনরুক্তি ঘটেছে সম্প্রতি প্রণীত ও সংসদে অনুমোদিত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে (২০০২)।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির (২০০২) খসড়ায় নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত জনসংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রাগুলি নিম্নপ্রকার —

সারণি - ৫.৪ ঃ ২০০২-২০১৫ সাল নাগাদ অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলি হল —

লক্ষ্য	বর্ষ
পোলিও রোগ নির্মূল করা	২০০৫
কুষ্ঠরোগ দূরীকরণ	২০০৫
কালাজ্বর দূরীকরণ	২০১০
ফাইলেরিয়ার (গোদ) দূরীকরণ	২০১৫
এইচ আই ভি/এইডস্ রোগের বৃদ্ধির হার শূন্যে নামিয়ে আনা	২০০৭
যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণু ঘটিত ও জলবাহিত রোগে মৃত্যু ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা	২০১০
দৃষ্টিহীনতার ঘটনা ০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা	২০১০
লক্ষ প্রতি প্রসূতি মৃত্যুহার ১০০ এবং হাজার প্রতি শিশু মৃত্যুহার ৩০-এ নামিয়ে আনা	২০১০
জনস্বাস্থ্য পরিষেবা সদ্ব্যবহারের হার বর্তমানের ২০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশের উপরে নিয়ে যাওয়া	২০১০
স্বাস্থ্যব্যবস্থার তত্ত্বাবধান এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত হিসাব এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা	২০০৫
স্বাস্থ্যের জন্য সরকারী ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের বর্তমান শতকরা ০.৯ ভাগ থেকে শতকরা ২.০ ভাগে নিয়ে যেতে হবে	২০১০
স্বাস্থ্যের জন্য মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অংশ অন্ততপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা	২০১০
রাজ্যের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বাজেটের শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে শতকরা ৭.০ ভাগে উন্নীত করা	২০০৫
ঐ বরাদ্দ আরো বাড়িয়ে শতকরা ৮ ভাগে নিয়ে আসা	২০১০

ভারতে স্বাস্থ্য প্রকল্পসমূহ

যদিও স্বাস্থ্য রাজ্যের আওতাধীন বিষয়, তা সত্ত্বেও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গৃহীত হওয়ার আগেই জাতীয় স্তরে নানাবিধ স্বাস্থ্য কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল —

১। জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচি,

২। জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি,

৩। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি,

৪। জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি,

৫। আন্ত্রিক রোগের নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি,

৬। জাতীয় গিনি কৃমি দূরীকরণ কর্মসূচি,

৭। জাতীয় অন্ধত্ব প্রতিরোধ কর্মসূচি,

৮। সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচি,

৯। ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত রোগ নিবারণ কর্মসূচি।

এই জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি ছাড়াও জাতীয় স্তরে পুষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কয়েকটি কাজও বর্তমানে চলছে। সেগুলি হল —

১। জাতীয় পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি,

২। জাতীয় জলসরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি,

৩। সামগ্রিক শিশু উন্নয়ন পরিষেবা,

৪। জাতীয় গলগন্ড প্রতিরোধ কর্মসূচি,

৫। STD এবং AIDS রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কর্মসূচি,

৬। রক্তাল্পতা নিরাময়ের কর্মসূচি,

৭। ন্যুনতম প্রয়োজন মেটানোর কর্মসূচি,

৮। বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহারের কর্মসূচি।

শিক্ষাক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার এবং পূর্ণ সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলছে। বিশেষত ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের সময় থেকেই অনেকগুলি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নানাবিধ কর্মসূচি যেমন অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড, শিক্ষক-শিক্ষণ, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, মহিলা সমাখ্যা, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পুষ্টিগত সহায়তার জাতীয় কর্মসূচি, বিহার, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং অন্ধপ্রদেশে রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচি, ১৮টি রাজ্যের ২৪৮টি জেলায় জেলাগত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (DPEP) গৃহীত হয়েছে। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি, তবে বালিকাদের, তপসিলী জাতি এবং উপজাতি শ্রেণির ছেলেমেয়েদের, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যা-লঘু ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতিদের বিদ্যালয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে উন্নতি ঘটেছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের (IIPS, 2000) জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়ঃক্রমের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৭৯ ভাগ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষায় সমাজের অংশগ্রহণ দেশের বর্তমান সাক্ষরতার মান অর্জনে অবদান রেখেছে। সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্পের মূল্যায়ন সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে স্বাধীনতা লাভের পরে এই প্রথমবার নিরক্ষর মানুষের মোট সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। তবে সাধারণভাবে সাক্ষরতার চিত্র বিশেষ করে গণপরিসংখ্যানের প্রশ্নে সঙ্কটপূর্ণ রাজ্যগুলিতে আজও গভীর উদ্বেগের কারণ। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে রাজ্যগুলির সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে একটি সময়-নির্দিষ্ট সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ২০১০ এর মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়ঃক্রমের সমস্ত বালক-বালিকাদের প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত মানের শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি আছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য যথাযথ শিক্ষাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সাক্ষরতার মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগদান, উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে সমান অংশীদার হিসাবে কাজ করতে পারেন। বালিকাদের শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। ছাত্রীদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে নানারকমের পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে। মহিলা সামখ্যা কর্মসূচিটি এমন একটি বড় পদক্ষেপ যা মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা স্বীকার করে। তদুপরি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে, যথা লিঙ্গ সমতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং ছোট পরিবারের নীতি অনুসরণ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা নিচ্ছে।

১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রণীত জাতীয় প্রারম্ভিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম এই বিষয়গুলি সারাদেশে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রকল্পটিকে নতুন আঙ্গিকে আবার প্রবর্তন করা হয়েছে।

পরিবেশ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি প্রকল্পগুলি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠনের সঙ্গে জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে যুক্ত করতে সাহায্য করছে।

১৯৮০ সাল থেকে প্রবর্তিত জাতীয় জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পটি জনসংখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের সঙ্গে সমন্বিত করার লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা করছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জনসংখ্যা, সম্পদ, পরিবেশ, উন্নয়ন ও জীবনমান সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব এবং মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা ছোট পরিবারের নীতি অনুসরণ করে জনসংখ্যা ও উন্নয়নের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

১৯৯৪ সালের জনসংখ্যা উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মসূচিতে যা বলা হয়েছে তাতে সব সরকারের কর্তব্য হচ্ছে বেশী শিশু মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণগুলি খতিয়ে দেখা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামোর মধ্যে সব মানুষকে, বিশেষতঃ সবচেয়ে দুর্বল এবং সুযোগবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলিকে, নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি দেওয়া —

ক) প্রজনন স্বাস্থ্য এবং শিশু স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব

খ) নবজাত শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার কর্মসূচি এবং

গ) পরিবার পরিকল্পনার পরিষেবা

এই পরিষেবার মধ্যে থাকবে — (ক) অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ এবং যৌন সংসর্গের দ্বারা সংক্রামিত ব্যাধিগুলির এবং এইচ আই ভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে পিতামাতার করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শদান, (খ) প্রসবের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা এবং নবজাতকের যত্ন সম্বন্ধে তথ্য যেমন - শুধুমাত্র স্তন্যপান করানো, কাম্য স্তরের স্তন্যপান এবং যথাযথভাবে তা কমিয়ে আনার এবং অনুপুষ্টিগত পরিপূরক ও ধনুষ্টংকারের টীকার প্রয়োজনীয়তা, (গ) স্বল্প ওজন বিশিষ্ট জন্মের ঘটনা হ্রাসে যথাযথ হস্তক্ষেপ এবং অন্যান্য পুষ্টিগত ঘাটতি জনিত ব্যাধিগুলি, যথা রক্তাল্পতা হ্রাসে অন্তর্ভুক্ত হবে তথ্য, শিক্ষা ও পরামর্শের মাধ্যমে মায়ের পুষ্টি বর্ধন।

শৈশবের প্রধান ব্যাধিগুলি বিশেষত সংক্রামক এবং পরজীবী সংক্রামিত ব্যাধিগুলিকে কমিয়ে আনতে এবং শিশুদের, বিশেষভাবে বালিকাদের মধ্যে, অপুষ্টি প্রতিরোধের প্রশ্নকে সব দেশের পক্ষে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এজন্য যে ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে তাদের লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করা, স্বাস্থ্যবিধিতে পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা এবং বিশেষত বালিকা এবং মহিলাদের সাক্ষরতা বাড়িয়ে সুনিশ্চিত করা যেন সব শিশু স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে বাস করতে পারে। মানসিক এবং শারীরিক উদ্দীপনার মাধ্যমে শিশুকে বড় করে তোলার জন্য বাবা-মায়ের কাছে তথ্য ও শিক্ষা পৌছে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ভারতের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিগুলির প্রধান দুর্বলতা এই যে সেগুলিতে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমদায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে প্রধানত মহিলাদের লক্ষ্য করেই চালানো হয়। এর অন্তর্নিহিত কারণগুলি হল-

ক) সমাজে মহিলাদের স্থান সম্বন্ধে জনগণের যথাযথ সচেতনতার অভাব।

খ) কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

গ) পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা।

সুস্থ সমাজের প্রগতির পথে এই কারণগুলিই বাধা সৃষ্টি করে। দেশের মহিলাদের বন্ধন মুক্তি এবং ক্ষমতায়নের মধ্যেই এর সমাধান নিহিত।

ষষ্ঠ অধ্যায় | জনসংখ্যা বণ্টন ঃ নগরায়ন ও অভিবাসন

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ যেভাবে ছড়িয়ে বসবাস করে তাকেই জনসংখ্যা বণ্টন বলা হয়। বর্তমানে নগরায়ন ও অভিবাসন বৃদ্ধির ফলে শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল উভয়স্থানেই জনসংখ্যা বিন্যাস পাল্টে যাচ্ছে এবং সেজন্যই বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই শতাব্দীর শেষে যখন জনসংখ্যা একটা স্থিতিশীল অবস্থায় এসে দাঁড়াবে, তখন গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যার অনুপাত অনেকটা হ্রাস পাবে।

অপরপক্ষে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ববৃদ্ধি সেখানকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি অন্তর্নিহিত মাত্রা, যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিক আছে। দ্রুত হারে নগরায়ন বৃদ্ধি সামাজিক এবং পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, পরিবার, পরিবেশ ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করবে — আর সেই চাপকে মোকাবিলা করাই আজকের পৃথিবীর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেছে। বিশ্ব সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতিনিধিরা নানাবিধ অঙ্গীকার করেছেন। বিশ্ব সম্মেলনগুলিতে সর্বজনস্বীকৃত লক্ষ্যগুলি আগামীদিনের নগরায়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে পরীক্ষার মুখে পড়বে। এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানো শহরগুলির ভবিষ্যৎ এবং মানব উন্নয়নের সম্ভাবনা বিকশিত করার জন্য অপরিহার্য।

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা বিকাশ (ICPD) সম্মেলনে গৃহীত লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির অন্যতম। জনসংখ্যা বিকাশ সংক্রান্ত (ICPD) এই বিশেষ লক্ষ্যগুলি ছিল প্রজনন স্বাস্থ্য সহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া, পরিবার পরিকল্পনা, যৌন স্বাস্থ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান দূরীকরণ, সর্বোপরি ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ এবং মহিলাদের জন্য সমতা ও অধিকার সুনিশ্চিত করা। গতিশীল নগরোন্নয়নের জন্য এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

নগরায়নের ধারণা

নগরায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যাতে একটি অঞ্চল গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য থেকে ধীরে ধীরে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি আহরণ করে এবং সেখানকার অধিবাসীরা কৃষিকাজের পরিবর্তে অন্যান্য শহুরে পেশায় নিযুক্ত হয়ে ও সেখানকার আচরণধারা আয়ত্ত করে নিজেদের শহরের উপযোগী করে তোলে।

নগরায়নের দুটি প্রধান দিক হল ঃ (ক) জনগণের গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে চলে আসা বা অভিবাসন যেখানে তারা প্রধানত গ্রামে চল নেই এমন কাজকর্মে বা পেশায় নিযুক্ত হন। এর ফলে গ্রামবাসীরা নগরবাসী হয়ে যান।

(খ) তাঁরা গ্রামের ভেতর বাস করেই গ্রামীণ জীবনধারার পরিবর্তে শহরের অ-কৃষি বৃত্তিতে নিযুক্ত হন এবং অনুরূপ আচরণধারা, মূল্যবোধ ও মনোভাব আয়ত্ত ক'রে শহুরে বা নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হন। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামটিই নগরে রূপান্তরিত হয়।

প্রথমোক্ত পরিবর্তনটি নির্ভর করে জনসংখ্যা, তার ঘনত্ব ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর; দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত উপাদানগুলিই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। এই দুটি দিক একে অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ নগরায়ন হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির ফসল। এগুলি একটি

সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে জনবিন্যাসের কাঠামো তৈরি করে দেয়।

ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক জনগণনায় কোনো স্থানকে নগর বলে চিহ্নিত করবার ধারণায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে কোনো অঞ্চলকে নগর বলে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণটি হল সেই স্থানের পৌর বা বিধিগত অবস্থান। এছাড়া ভারতবর্ষে যখন আদমসুমারি সংক্রান্ত কাজকর্ম শুরু হয়, তখন এমন কিছু স্থানকে নগর বলে চিহ্নিত করা হয় যেগুলিতে বিশেষ কিছু জনতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। নগর বা পৌর অঞ্চলের সংজ্ঞা দীর্ঘ দিন অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৬১ সালের পর থেকে এই সংজ্ঞাকে অনেক বেশি অনমনীয় ও অভিন্নরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী নগর অঞ্চলের সংজ্ঞা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছে ঃ

(ক) সমস্ত বিধিবন্ধ শহরগুলি অর্থাৎ যে সব জায়গায় পৌরসংস্থা, পৌরনিগম, সেনাছাউনি, পর্যদ অথবা বিজ্ঞাপিত অঞ্চল ইত্যাদি আছে।

(খ) অন্যান্য সব স্থান যেগুলিতে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় ঃ-

(১) ন্যূনতম জনসংখ্যা যেখানে ৫০০০

(২) অন্তত ৭৫ ভাগ পুরুষ যেখানে কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত আছেন।

(৩) প্রতি বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে যেখানে অন্তত ৪০০ জন বসবাস করেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে সংশোধিত মিউনিসিপাল আইন অনুসারে বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুটা অন্যরকম, যা পরে আলোচিত হবে।

রাজ্যগুলিতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে জনগণনার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক এবং আদমসুমারী মহাধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এমন কতগুলি অঞ্চলকে নগরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যেগুলিতে শহরের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ থাকলেও ওপরের (খ) অংশে উল্লিখিত সবগুলো শর্ত যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে না।

এছাড়া শহরগুলি প্রসারিত হলে বর্ধিত স্থানগুলিকেও পৌর অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মোটামুটি বড় এবং স্বীকৃত রেল কলোনী, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বা এলাকা, বন্দর সংলগ্ন জায়গা, সেনাশিবির প্রভৃতি শহরাঞ্চলকে ঘিরে তৈরি হয়। এই সমস্ত স্থান নগরের চেহারাই পেয়ে যায় যদিও তাদের কোন-কোনটিতে শহর হিসেবে বিবেচিত হবার নির্ধারিত লক্ষণগুলির সবকটি পাওয়া যায় না। এগুলিকেও বর্ধিত অংশ বলা হয় এবং শহরের সঙ্গেই গণ্য করা হয়। এরকম প্রতিটি শহর এবং তাদের বর্ধিত অংশগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে শহরপুঞ্জ বলা হয়। ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত শহরগুচ্ছ ধারণার পরিবর্তে ১৯৭১ সালে এই 'শহরপুঞ্জ' ধারণাটি গৃহিত হয়।

ভারতবর্ষে ১৯৯১ সালের জনগণণা অনুযায়ী শহরপুঞ্জ কথাটির অর্থ হল ঃ একটি অবিচ্ছিন্ন নাগরিক অঞ্চল যাতে সাধারণত থাকে একটি শহর ও তার সংলগ্ন বর্ধিত অংশ অথবা দুই বা ততোধিক পাশাপাশি শহর ও তাদের স্বীকৃত বর্ধিত অঞ্চল (যদি থাকে)।

জনগণনায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে পৌর অঞ্চলগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ

(I)	জনসংখ্যা	১,০০,০০০ এবং তার উর্দ্ধে
(II)	জনসংখ্যা	৫০,০০০ - ৯৯,৯৯৯
(III)	জনসংখ্যা	২০,০০০ - ৪৯,৯৯৯
(IV)	জনসংখ্যা	১০,০০০ - ১৯,৯৯৯
(V)	জনসংখ্যা	৫,০০০ - ৯,৯৯৯
(VI)	জনসংখ্যা	৫০০০ এর কম।

শহুরে জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্বন্ধে তার আয়তন, শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রবণতা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলির অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করার জন্য ওপরের সারণির শেষ তিনটি ভাগকে একটি ভাগে নিম্নোক্তভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে ঃ

শ্রেণি		জনসংখ্যা
নগর	(I)	১,০০,০০০ এবং তদূর্ধ্বে
বড় শহর	(II)	৫০,০০০ - ৯৯,৯৯৯
মাঝারি শহর	(III)	২০,০০০ - ৪৯,৯৯৯
ছোট শহর	(IV-VI)	২০,০০০ এর কম।

বিশ্বস্তরে নগরায়ন

আজকের নগর-প্রধান বিশ্বে শহরগুলির বৃদ্ধিই একুশ শতকের প্রথমার্ধে উন্নয়নের ওপর সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলবে। সারা পৃথিবীতে নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা ২৬০ কোটি যার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই আছে ১৭০ কোটি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির চেয়ে নগরের জনসংখ্যা দ্রুততর বাড়ছে। কোনো কোনো শহরের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নজিরবিহীন। আগামী দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি মানুষ শহরে বাস করবেন (UNFPA, 1966)।

এই নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অধিকাংশই ঘটবে উন্নয়নশীল দেশে। ১৯৭০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীর নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার যে ২০৬ কোটি বৃদ্ধি ঘটবে তার ৯২.৯ শতাংশ হবে উন্নয়নশীল দেশে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে দু'জন উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। ২০১৫ সালে এই অনুপাত আরও বৃদ্ধি পাবে। আর ২০২৫ সালের মধ্যে এই হার বেড়ে প্রতি পাঁচজনে প্রায় চারজন হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার পৃথিবীর সবথেকে গরীব দেশগুলিতে দেখা যাবে; আর এই নতুন শহরবাসীর মধ্যে মহিলা ও শিশুরাই হবে বিশ্বের দরিদ্রতম।

পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলোতেই জনগণের বড় অংশ বসবাস করেন। ১৯৫০ সালে ৮৩টি এমন শহর বা অনুরূপ অঞ্চল ছিল, যেখানে জনসংখ্যা ১০ লক্ষ; এর মধ্যে ৩৪টি শহর ছিল উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্গত। আজ এই শহরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮০। ২০১৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হবে — এই সম্ভাবনা আছে।

১০ লক্ষ জনসংখ্যার শহরগুলি এবং পৃথিবীর ১৯টি মহানগরী বা মেগাসিটির মধ্যে ১৫টিই উন্নয়নশীল দেশে অবস্থিত (UNFPA, 1966)।

১৯৭০ সালে অতি বৃহৎ শহর বোঝাতে মেগাসিটি শব্দটি রাষ্ট্রসংঘ প্রথম ব্যবহার করে। এই মেগাসিটি

বলতে ১ কোটি বা তার অধিক সংখ্যক মানুষ বসবাস করে এমন শহরগুলিকে বোঝান হয়। ১৯৭৫ সালে বিশ্বে এরকম মেগাসিটি ছিল মাত্র পাঁচটি। ২০১৫ সালের মধ্যে এই মেগাসিটির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২৩। এই মেগাসিটির মধ্যে থাকবে ভারতের মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি ও হায়দ্রাবাদ। কোটি কোটি মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে বসবাস করতে আসেন উন্নত জীবনযাপনের আশায়। কিন্তু প্রায়শই তাঁরা দেখেন তাঁদের জীবন ক্রমশই কঠিনতর হয়ে পড়ছে। অনেক শহরেই ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ বাস করেন শহর-প্রান্তের গরীব বস্তি এলাকায়। এটা ঠিকই যে ভূপৃষ্ঠে মাত্র ২ শতাংশ শহরাঞ্চল। কিন্তু সেই অনুপাতে পরিবেশের ওপর তার প্রভাব অনেক বেশি।

১৯৫০ সালে বৃহত্তম শহর নিউইয়র্কের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটির বেশি। বর্তমানে এরূপ ১৯টি বড় শহরের প্রতিটিতে জনসংখ্যা ১ কোটির বেশি; আর আজ পৃথিবীর বৃহত্তম শহর টোকিওর জনসংখ্যাই হল ২.৬৫ কোটি।

ভারতবর্ষে নগরায়ন

ভারতবর্ষে নগর সভ্যতার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। ভারতবর্ষে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উন্নয়ন সেই হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে অর্থাৎ ২৩৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত দেখা যায়। এই ধারা উপমহাদেশ ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম অংশে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছিল। সেখানে শহরাঞ্চলের একটি শৃংখল দেখা যায় যেটি ইরান, ইরাক থেকে গ্রীস, মিশর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আসার সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রেল ও সড়ক সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্দর নগরী স্থাপিত হয়। এই উপনিবেশের আমলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ের মতো বন্দর-নগরী স্থাপন করা হয়। এই শহরগুলি দিল্লি এবং অন্য কয়েকটি বড় শহরের সঙ্গে প্রধান নগরে বা মহানগরীতে রূপান্তরিত হয় ও দেশের নগর চিত্রে প্রাধান্য লাভ করে।

১৯০১ সালে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ২.৫৮ কোটি, ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮.৫৩ কোটিতে অর্থাৎ শহরের জনসংখ্যা দশ গুণেরও বেশি বেড়ে যায়। ১৯০১ সালে শহর বা শহরপুঞ্জের সংখ্যা যেখানে ১,৮২৭ ছিল, ২০০১ সালে তা বেড়ে ৫১৬১ তে দাঁড়ায়। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত শহরের সংখ্যা একই হারে বেড়েছে। ১৯৬৭ সালে কোনো স্থান শহর হিসাবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত কিনা, সেই মাপকাঠিগুলিকে অনেক বেশী কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হল। তখন অনেকগুলি শহরই শহরের তালিকা থেকে বাদ গেল এবং শহরের সংখ্যা ২৮৪৩ (১৯৫১) থেকে নেমে ২৩৬৫ (১৯৬১) তে দাঁড়ায়। শহরের জনসংখ্যার অনুপাতও ১৯০১ সালের ১০.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০১ সালে ২৭.৯৮ শতাংশ দাঁড়ায়। শহরগুলির জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ০.০৩ (১৯০১) থেকে বেড়ে ৩.১৬ (১৯৯১) তে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে ৪৩ বছরে। ১৯০১ সালে যা ছিল ২.৫৮ কোটি, ১৯৪৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫.১৬ কোটি। আর এই সংখ্যা ১০.৩০ কোটি হতে লেগেছে মাত্র ২৬ বছর। আজকের শহরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার থেকে ধারণা করা যায় যে এই জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে ১৭ বছরের বেশি সময় লাগবে না। ১৯৯০ সালে যে জনসংখ্যা ছিল ২০.৬৪ কোটি, তা ২০০৭ সালের মধ্যে ৪০ কোটিতে দাঁড়াবে।

নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার বণ্টনের দিক থেকে তিন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, অপেক্ষাকৃত

ছোট শ্রেণির শহর থেকে বড় শ্রেণির শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়েছে। ১৯০১ সালে সমগ্র নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার মধ্যে ১,০০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মানুষ ছিল মাত্র ২৬ শতাংশ। ২০০১ সালে তা বেড়ে ৬১.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণির শহরের অসম বৃদ্ধি জনসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ১৯০১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ১,০০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলির জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬.৬ লক্ষ থেকে ১৭.২ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোটমাপের শহরগুলিতে সেই সময়ে জনসংখ্যা অনেক কম বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃহৎ শহরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থানিক বিন্যাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের লক্ষণ।

ভারতবর্ষে নগরায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যদিও ভারতবর্ষে নগরায়ন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, তথাপি এখানকার নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।
- ভারতবর্ষে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, কিন্তু অন্যান্য কিছু উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম।
- ভারতবর্ষে নগরায়নের কাঠামোর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষত চীন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কাঠামোর কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে।
- অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিমাণের বিচারে ছোট শহর ও বড় শহর অর্থাৎ শহরগুলির মধ্যে ভারসাম্য নেই।
- অর্থনৈতিক নীতিসমূহ নগরকেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ার ফলে মহানগরীগুলিতেই নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।
- অধিকাংশ বড় শহরগুলির পরিকাঠামো যথেষ্ট ভাল না হওয়ায় সেখানে পৌর পরিষেবার ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে গেছে।

কেন্দ্রীভূত নগরায়ন

আমাদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য ছিল ছোট এবং মাঝারি শহরের সমন্বিত উন্নয়ন। এই লক্ষ্যকে সার্থক করার নানাবিধ চেষ্টাও অনেকদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হল একদিকে নগরায়নের গতি ধীর হয়ে আসছে ও অন্যদিকে শহর প্রান্তে বেশি সংখ্যায় নতুন নতুন নগর গড়ে উঠেছে।

২০০১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান এবং ওপরের বৈশিষ্ট্য দুটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আজকের নগরোন্নয়নের কেন্দ্রীভবনের চরিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এ থেকে আরো ধরে নেওয়া যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বড় বড় শহরগুলির এই অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি এবং প্রসার দুটিই ঘটতে থাকবে অর্থাৎ বড় বড় পৌর বা শহরকেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কেন্দ্রগুলিকে ঘিরেই শহরতলি অঞ্চলও গড়ে উঠবে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে এদের সংলগ্ন অঞ্চলে শিল্পায়ন ও আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসারকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলি মূলত বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফল।

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই প্রবণতা মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই এর মতো অন্যান্য মহানগরীর ক্ষেত্রেও

দেখা যাবে। কারণ ১৯৭১ সালে প্রামাণ্য শহরাঞ্চল বলে যে স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থিত এমন অনেকগুলি গ্রামাঞ্চলকে ধরে নেওয়া হয়েছে যেগুলোর নগরায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আশা করা যায় যে, আগামী দুই দশকের মধ্যে এই সব অঞ্চল পুরোপুরি শহরে পরিণত হবে। শহর-গ্রামের বিকাশের হারে অসমতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বড় শহর বিশেষ করে দিল্লির মতো অতি বৃহৎ শহরের সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলগুলিতে গত এক দশকে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যেটা দিল্লীর শহরপুঞ্জের প্রায় দ্বিগুণ। শহর কেন্দ্রিক জনসংখ্যার এই যে ঘন সন্নিবেশ তা আরও বেশি দেখা যাচ্ছে দশ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলির ক্ষেত্রে। এই শ্রেণির শহর ১৯০১ সালে ছিল মাত্র একটা যা ২০০১ সালে ৩৫-এ দাঁড়িয়েছে ও তাদের জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০.৭৮ কোটি।

ভারতবর্ষের শহরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন যেভাবে হয়েছে, বিশেষতঃ এক লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলিতে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপও বিশেষ ভাবে জাতীয় শহরাঞ্চলগুলিতে সীমাবদ্ধ ও অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে নগরায়ন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে ঘনীভূত নগরায়নের দিকেই যাচ্ছে।

নগরায়নকে প্রভাবিত করার উপাদান সমূহ ঃ—

শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১) স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঃ- জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবধানই হল জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি।

২) গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে আসার প্রবণতা, যার কারণ -

ক) গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা ধারণ ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যাওয়া

খ) কৃষি জমির খণ্ডীকরণ এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নততর পদ্ধতির প্রবর্তন-এর ফলে কৃষিকার্যে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস।

৩) বড় শহরগুলির জোরালো আকর্ষণ, কারণ -

ক) চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি

খ) উন্নতমানের যানবাহন ও যোগাযোগের সুবিধা

গ) জীবন যাপনের মৌলিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নত ব্যবস্থা।

৪) শহর এবং নগরের সীমানা সম্প্রসারণ।

পরবর্ত্তী সারণিতে নগরায়নের স্তর ও প্রবণতার সাথে উন্নয়নের আর্থিক ও সামাজিক জনতত্ব সংক্রান্ত সূচকের আন্তঃ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, যে সমস্ত উন্নত রাজ্যে (হরিয়াণা ব্যতীত) মাথা পিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যেখানে বেশী সেখানে নগরায়নের প্রবণতা বেশী। অপরদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাজ্য, যেখানে মাথা পিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কম সেখানে নগরায়ন সারা দেশের তুলনায় কম। এই একই সম্পর্ক দেখা যাবে যদি সাক্ষরতার সঙ্গে নগরায়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায়।

ভারত এবং প্রধান রাজ্য গুলিতে নগরায়ন এবং আর্থিক, সামাজিক ও গণপরিসংখ্যানগত উন্নয়নের সূচকসমূহ

ভারত/রাজ্য	জনসংখ্যায় শহরবাসীর শতাংশ	গড় বার্ষিক উন্নয়নের হার (শহর)	মাথাপিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন	সাক্ষরতার হার	শিশু মৃত্যুর হার (হাজার প্রতি)
ভারত	২৫.৭২	৩.০৯	৭৭৭	৫২	৮০
রাজ্য					
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৬.৮৪	৩.৫৫	৭৫৮	৪৫	৭০
আসাম	১১.০৮	৩.২৭	৬০৫	৫৩	৭৬
বিহার	১৩.১৭	২.৬৫	৪৮২	৩৮	৭৫
গুজরাট	৩৪.৪০	২.৯০	৮৬০	৬১	৭২
হরিয়াণা	২৪.৭৯	৩.৫৮	১২৩৩	৫৫	৬৯
কর্ণাটক	৩০.৯১	২.৫৫	৭৯৯	৫৬	৭০
কেরালা	২৬.৪৪	৪.৭৬	৬৩৯	৯১	১৭
মধ্যপ্রদেশ	২৩.২১	৩.৭১	৫৮৩	৪৩	১১১
মহারাষ্ট্র	৩৮.৭৩	৩.২৭	১০৩৯	৬৩	৫৮
ওড়িষ্যা	১৩.৪৩	৩.০৮	৫৩৫	৪৯	১২২
পাঞ্জাব	২৯.৭২	২.৫৬	১৬৫২	৫৭	৬১
রাজস্থান	২২.৮৮	৩.৩১	৬৪৬	৩৯	৮৪
তামিলনাড়ু	৩৪.২০	১.৭৬	৮২৮	৬৪	৫৯
উত্তরপ্রদেশ	১৯.৮৯	৩.২৯	৬০৭	৪২	৯৯
পশ্চিমবঙ্গ	২৭.৩৯	২.৫৪	৮৬০	৫৮	৬৩

[Source(s) : (1) Census of India, 1991, Paper Nos. 1 and 2. Provisional Population Total Page Nos. 73 (Paper-1) and 19 and 51 (Paper No. 2).

(2) Government of India (Central Statistical Organization) Statistical Year Book, 1989 p. 345

(3) Registrar General, India, Sample Registration Bulletin. Vol. XXVI No. 1, June, 1992 p.3]

১৯৯১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন অনুসারে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ *(NCERT)* -এর মূল খসড়া পুস্তকে এই চিত্র দেওয়া আছে। পরবর্তী দশকে সবক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। সবকটি বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি বলে এই আলোচনায় পূর্বতন চিত্র দেওয়া হল। তবে শহরবাসীর শতাংশের

২০০১- এর চিত্রের সঙ্গে ঐ সময়ের সাক্ষরতা ও শিশুমৃত্যুর হার যেখানে পৌঁছেছে সেটি পরবর্তী সারণিতে পাওয়া যাবে।

ভারত/রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জনসংখ্যায় শহরবাসীর শতাংশ	সাক্ষরতার হার	শিশুমৃত্যুর হার (হাজার প্রতি)
ভারত	২৭.৮২	৬৪.৮	৬৩
রাজ্য			
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৭.৩০	৬০.৫	৬২
অরুণাচল প্রদেশ	২০.৭৫	৫৪.৩	৩৭
আসাম	১২.৯০	৬৩.৩	৭০
বিহার	১০.৪৬	৪৭.০	৬১
ছত্তিশগড়	২০.০৯	৬৪.৭	৭৩
গোয়া	৪৯.৭৬	৮২.০	১৭
গুজরাট	৩৭.৩৬	৬৯.১	৬০
হরিয়াণা	২৮.৯২	৬৭.৯	৬২
হিমাচল প্রদেশ	০৯.৮০	৭৬.৫	৫২
জম্মু ও কাশ্মীর	২৪.৮১	৫৫.৫	৪৫
ঝাড়খণ্ড	২২.২৪	৫৩.৬	৫১
কর্ণাটক	৩৩.৯৯	৬৬.৬	৫৫
কেরালা	২৫.৯৬	৯০.৯	১০
মধ্যপ্রদেশ	২৬.৪৬	৬৩.৭	৮৫
মহারাষ্ট্র	৪২.৪৩	৭৬.৯	৪৫
মণিপুর	২৬.৫৮	৭০.৫	১৪
মেঘালয়	১৯.৫৮	৬২.৬	৬১
মিজোরাম	৪৯.৬৩	৮৮.৮	১৪
নাগাল্যাণ্ড	১৭.২৩	৬৬.৬	N.A.
উড়িষ্যা	১৪.৯৯	৬৩.১	৮৭
পাঞ্জাব	৩৩.৯২	৬৯.৭	৫১
রাজস্থান	২৩.৩৯	৬০.৪	৭৮
সিকিম	১১.০৭	৬৮.৮	৩৪
তামিলনাড়ু	৪৪.০৪	৭৩.৫	৪৪
ত্রিপুরা	১৭.০৬	৭৩.২	৩৪
উত্তরাঞ্চল	২৫.৬৭	৫৬.৩	৪১

উত্তরপ্রদেশ	২০.৭৮	৭১.৬	৮০
পশ্চিমবঙ্গ	২৭.৯৭	৬৮.৬	৪৯
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল			
আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ	৩২.৬৩	৮১.৩	১৫
চণ্ডীগড়	৮৯.৭৭	৮১.৯	২১
দাদরা ও নগর হাভেলী	২২.৮৯	৫৭.৬	৫৬
দমন ও দিউ	৩৬.২৫	৭৮.২	৪২
দিল্লী	৯৩.১৮	৮১.৭	৩০
লাক্ষাদ্বীপ	৪৪.৪৬	৮৬.৭	২৫
পণ্ডিচেরী	৬৬.৫৭	৮১.২	২২

Source : 1) Census of India, 2001
2) SRS Bulletin, April, 2004 & April 2004 (Supplementar

বেশীর ভাগ রাজ্যের ক্ষেত্রে নগরায়নের পর্যায়কে যদি সাক্ষরতার স্তরের প্রেক্ষিতে দেখা যায় তাহলে অনুরূপ চিত্রই প্রকাশ পাবে। কতকগুলি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম আছে — যেমন আসাম ও হরিয়াণায় সাক্ষরতার হার বেশি কিন্তু নগরায়নের মাত্রা কম। আর অন্ধ্রপ্রদেশে সাক্ষরতার হার কম, কিন্তু নগরায়নের মাত্রা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। আবার যেসব রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার বেশী সেখানে নগরায়নের মাত্রা কম। ব্যতিক্রম হিসেবে একদিকে হরিয়াণা ও অন্যদিকে গুজরাতের নাম উল্লেখ করা যায়।

নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ওপরে দেওয়া উন্নয়নের সূচকগুলির বিচারে বলা চলে যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রবণতা দেখা যায়। গত দশকের পরিসংখ্যানে মাথা পিছু যেসব রাজ্যে নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সাক্ষরতার হার বেশি সেখানে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার কম। অপরদিকে যে সমস্ত রাজ্যের এই সূচকগুলি কম ছিল সেখানে এই বৃদ্ধির হার বেশী। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়াণা, কেরল ও মহারাষ্ট্র— যেখানে মাথাপিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেশী, আবার শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশী। অপরদিকে বিহারে যেখানে মাথা পিছু নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম সেখানে বৃদ্ধির হারও দেশীয় গড়ের তুলনায় কম। আবার আসাম, হরিয়াণা, কেরল ও মহারাষ্ট্রতে সাক্ষরতার হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উভয়ই বেশী । অন্যদিকে বিহারে এর বিপরীত প্রবণতা দেখা যায়। পূর্ববর্তী সারণিতে দেখানো হয়েছে যে সমস্ত রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার দেশীয় গড়ের তুলনায় বেশি, সেখানে এই নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি জাতীয় স্তরের গতির তুলনায় বেশি। আবার বেশীরভাগ রাজ্যে- যেখানে শিশুমৃতুরে হার বেশি, সেখানে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কেরালার চেয়ে কম। কেরালায় শিশু মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন (১৭) এবং নগরায়নের মাত্রা সর্বোচ্চ (৪.৭৬)। কেরলের পরেই অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, হরিয়াণা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের নাম করা যায় যেখানে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের গড় হারের তুলনায় বেশি।

উন্নত রাজ্যগুলিতে ধীর গতিতে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা ও কম উন্নত রাজ্যগুলিতে ভবিষ্যতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এটাও হতে পারে যে উন্নত রাজ্যে আগে থেকেই অনেক বেশি পরিমাণে নগরায়ন ঘটে গেছে আর অনুন্নত রাজ্যগুলি এখনও সেই গতি আনার চেষ্টা করছে।

নগরায়নের ফলাফল

১। আজকের উন্নত দেশগুলি অতীতে যতটা শিল্পোন্নত ছিল ভারতবর্ষ তা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এছাড়াও সম্প্রতি ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় মধ্য স্তরকে (Secondary stage) ছাপিয়ে গেছে তৃতীয় স্তর (Tertiary Stage)। তার ফলে শহরাঞ্চলে বেকারত্ব ব্যাপক হয়েছে এবং আয়ের স্তর নেমে গেছে।

২। ভারতবর্ষে শহরগুলি যেভাবে আর্থব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতার তুলনায় দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে, তাতে দেশের নগরায়নের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এটাও বলা হয় যে, মৌলিক নাগরিক পরিষেবায় বিনিয়োগ করার মত যথেষ্ট উদ্বৃত্ত সম্পদ শহরগুলি উৎপাদন করে না, ফলে গ্রামাঞ্চলের সম্পদের ওপরই শহরগুলিকে নির্ভর করতে হয়। ফলে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে অসমভাবে সম্পদ বণ্টন হয়ে থাকে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩। জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতির সমন্বয়ে বর্তমান নাগরিক পরিকাঠামো এবং পরিষেবা ক্রমবর্ধমান বৃহৎ এবং নাগরিক জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এতে পরিবেশগত সমস্যা, জনাকীর্ণতা এবং দূষণের সমস্যাগুলি তীব্র হয়ে উঠছে। নাগরিক জীবনযাত্রার গুণগত মান দ্রুত একটা সংকটজনক অবস্থার দিকে এগোচ্ছে।

১৯৮৮ সালে জনসংখ্যা সংকট কমিটির (The Population Crisis Committee 1988) পর্যালোচনায় নগরজীবনের জন্য দশটি সূচক চিহ্নিত হয়েছে যেখানে শহরের বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করার জন্য ১০টি বিষয় আছে, প্রতিটি সূচকে ১০ পয়েন্ট স্কেল আছে। এই স্কেল অনুযায়ী বিভিন্ন শহর বিভিন্ন রকম মান পেয়েছে। কোনো কোনো শহর ৮৬-র মতো উঁচু মান পেয়েছে, আবার কোনো শহরের মান ১৯। এছাড়া শহরগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে — খুব ভাল, ভাল, সাধারণ ও দুর্বল।

তৃতীয় বিশ্ব থেকে শুধুমাত্র সিঙ্গাপুর খুব ভাল স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষের ৯টি শহর দুর্বল শ্রেণির অন্তর্গত। এই দশটি সূচক হল ঃ

১) জনগণের নিরাপত্তা — প্রতি ১,০০,০০০ মানুষ পিছু খুনের সংখ্যা।
২) খাবারের মূল্য — আয়ের কত শতাংশ খাবার কিনতে ব্যয় হয়।
৩) জীবন যাপনের জন্য বসবাসের জায়গা — ঘর পিছু কজন মানুষ থাকে।
৪) বাড়ি ঘরের মান — জল ও বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন বাড়ির শতকরা ভাগ।
৫) যোগাযোগ ব্যবস্থা — প্রতি ১০০ জনের মধ্যে কজনের টেলিফোন আছে।
৬) শিক্ষা — শিশুদের শতকরা কত অংশ মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে।
৭) জনস্বাস্থ্য — প্রতি এক হাজার সপ্রাণ নবজাতকের মধ্যে শিশুমৃত্যুর ঘটনা।
৮) শান্তি ও নিরুপদ্রব অবস্থা — শব্দদূষণের মাত্রা।
৯) যানবাহনের স্রোত — ব্যস্ত সময়ে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় গাড়ি কত মাইল চলে।
১০) নির্মল বাতাস — দূষণ প্রতিকার ব্যবস্থা।

শহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলতে পারে নি। ফলে দারিদ্র্য বেড়েছে। মুম্বাই ও কলকাতায় ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ মানুষ এমন বস্তিতে বাস করেন যেখানে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থাগুলিও পৌঁছানো যায় না। [পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এই তথ্যের সঙ্গে মেলে না। এই রাজ্য সংক্রান্ত স্বতন্ত্র সংযোজন দ্রষ্টব্য।]

ভারতবর্ষে অতি-নগরায়ন হয়েছে বলে যে ধারণা দেওয়া হয় তার কারণে

- শিল্পায়নের মাত্রার সঙ্গে নগরায়নের মাত্রার সামঞ্জস্য নেই।
- নগরায়নের প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল, ফলে তা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতিকে ব্যাহত করে।
- পরিকাঠামোগত অবস্থা ভাল না হওয়ায় নগরায়নের ক্রমবর্ধমান চাপ বহন করতে পারে না।
- যে সমস্যাটি শহরের মানুষের সবথেকে চিন্তার তা হল আশ্রয়, অর্থাৎ উপযুক্ত বাসস্থান।
- ভারতবর্ষের শহরেরর জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ বস্তিতে বাস করে; এই জনসংখ্যার অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়ছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণের তুলনায় এটিই উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়ন

ভারতবর্ষে শহরের বৃদ্ধির সঙ্গে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো সামঞ্জস্য নেই। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপেই অনেক বড় বড় শহরের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে। তার ফলে শহরে দারিদ্র্য বেড়েছে। এই ধরনের চাপ কমাতে হলে সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু স্থায়ী সমাজোন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন—মহিলাদের ক্ষমতায়ন যাতে থাকবে স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্যের পরিষেবা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পুরুষ ও নারী সকলের কাছে পরিষেবাগুলি পৌঁছে দেওয়া ও সর্বাঙ্গীণভাবে উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা।

ভবিষ্যতে নগরায়নের ফলে শহরে প্রাকৃতিক পরিবেশগত ও সম্পদগত, সামাজিক সংহতি আর ব্যক্তিগত অধিকার সংক্রান্ত নানা সমস্যা বা ঝুঁকির দিক আছে। কিন্তু নগরায়নের মধ্যে যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনাও আছে। বড় বড় শহরগুলিতে যে ধরনের ব্যাপক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত হয়েছে বা সর্বোচ্চ ধরনের যে সামাজিক সংস্থাগুলি সেখানে দেখা যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে এই শহরগুলি মানব-উন্নয়নের নতুন দিশারী হয়ে উঠবে। উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকরা শহর থেকেই শ্রমিক, মূলধন ও বাজার ইত্যাদির যোগান পেয়ে থাকেন। শহরগুলিই সামাজিক পরিবর্তনে গতি আনে। স্বাস্থ্য, সাক্ষরতা ও সামাজিক গতিশীলতা সূচক শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে উচ্চে অবস্থান করে। সর্বোপরি আর সব কিছুর মধ্যে নগরোন্নয়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা, প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ, ন্যায্য বেতনে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্ভবপর।

ভবিষ্যতে নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব জনসংখ্যার চাপের মধ্যে সামাজিক উন্নয়নকে ধরে রাখাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে আমাদের নীতির মূল ভাবনা হওয়া উচিত যে, দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য ও বড় পরিবারের দুষ্টচক্রের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করা। অনেক মাঝারি ও ছোট শহরে বাঞ্ছিত উন্নয়নের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বিশেষ করে পরিকাঠামোগত সামাজিক পরিষেবা এবং অত্যাবশ্যক মৌলিক পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। অঞ্চলের এবং স্থানীয় সম্পদের বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে। গ্রাম ও শহরের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। ধারণযোগ্য গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে নীতিগুলির অভিমুখ হবে শ্রম নিবিড়, গ্রামের যুবকদের অকৃষিকাজে প্রশিক্ষণ এবং কার্যকর যানবাহন ও যোগাযোগের নিশ্চয়তা দিতে হবে। স্থানীয় উন্নয়নকে সাহায্য করার জন্য প্রশাসন এবং পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বিবেচনা করতে হবে। শিল্প-বাণিজ্যকে শহর ছেড়ে

গ্রামের দিকে চলে যেতে উৎসাহিত করতে হবে। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয়ক্ষেত্রেই পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেক দেশে নগরায়নের ভয়াবহ কুফলগুলির কারণ হচ্ছে যে সরকার তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত নগরায়নের মোকাবিলা করতে পারে নি। পরিমিতভাবে জমি ব্যবহারের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। জীবনের নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নত করার দিকে, সেই সঙ্গে মৌলিক পরিকাঠামোর (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃত্তিগত শিক্ষা ও তার পরিবর্তন প্রভৃতি) উন্নয়নের প্রতি উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে যে চাপ ও সমস্যা আসছে সেই চাপ ও সমস্যাগুলি সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে সব মানুষ শহরের বস্তিতে থাকেন অথবা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের ঝুঁকিবহুল অঞ্চলে থাকেন তাঁদের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। জল, বর্জ্য পদার্থ, আলো-বাতাস, পরিবেশ-অনুকূল শক্তি ও যোগাযোগের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

<u>অভিবাসনের ধারণা</u>

কোনো স্থানের জনসংখ্যার পরিবর্তন তিন ধরনের জনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ফসল ঃ প্রজনন ক্ষমতা, মৃত্যুহার ও অভিবাসন। প্রথম দুটি প্রক্রিয়া থেকে অভিবাসন কয়েকটি দিক থেকে পৃথক ঃ

১) এটা কোনো জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, আর্থ-সামাজিক বিষয়।

২) অভিবাসন হল এক স্থান পরিত্যাগ করে অন্য কোনো স্থানে চলে গিয়ে বসবাস করার প্রক্রিয়া। এর ফলে দু-ধরনের জনসংখ্যার বিবেচনা প্রয়োজন, যারা বাস করে — (এক) উৎসস্থলে, (দুই) লক্ষ্যস্থলে।

৩) এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই এই বিষয়ে কোনো উচ্চ বা নিম্নসীমা নির্দিষ্ট নেই। একদল মানুষ এমন থাকেন যাঁদের অঞ্চলের বাইরে অথবা ভেতরে ভ্রমণের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আবার এমন দলের মানুষ আছেন যাঁরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করতে পারেন।

কোনো মানুষ যখন তাঁর বাসস্থল এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবর্তন করেন অথবা দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তর করেন তাঁকে তখন অভিবাসক বলা হয়। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যাবার এই প্রক্রিয়াকে অভিবাসন বলা হয়। এই স্থানান্তর তিন রকম ভাবে হতে পারে ঃ-

১) **আন্তর্জাতিক অভিবাসন ঃ** যখন বাসস্থানের পরিবর্তন দেশের সীমানা অতিক্রম করে যায় তখন তাকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলা হয়।

২) **অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঃ** বাসস্থানের পরিবর্তন যখন দেশের মধ্যে থেকে অন্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা হয়।

৩) **স্থানীয় অভিবাসন ঃ** বাসস্থানের পরিবর্তন যখন একই অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত হয় তাকে স্থানীয় স্থানান্তর বলা হয়।

এটা বুঝতে হবে যে, সাময়িক বাসস্থান পরিবর্তন অভিবাসন বলে গণ্য হয় না।

অভিবাসন সম্বন্ধে মূল ধারণা তৈরি হয় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ভিত্তিতে। কারণ স্থানীয় কোনো পরিবর্তন অঞ্চলের জনসংখ্যার গঠন ও সংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলে না।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সীমানা নির্দিষ্ট করা যায় ঃ (i) প্রাদেশিক বা রাজ্যের সীমানা, (ii) জেলার সীমানা, (iii) শহর বা গ্রাম ইত্যাদির সীমানা প্রভৃতি। স্পষ্টত অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর সেই স্থানান্তরকেই বলা

হয় শুধুমাত্র যেখানে প্রাদেশিক সীমানা অতিক্রম করা হচ্ছে। এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে যে যাতায়াত বা স্থানান্তর হচ্ছে তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা চলে না। অপরপক্ষে, শহর বা গ্রামাঞ্চলের সীমানার ওপর ভিত্তি করে যদি স্থানান্তরের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়, তাহলেই কি স্থানান্তরের সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব? যেমন গ্রীষ্মকালে গরমে হাঁসফাস করা দিনগুলিতে যদি কেউ পাহাড়ী অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাঁকে কি মাইগ্রান্ট বা স্থানান্তরিত মানুষের আখ্যা দেওয়া যাবে? অনুরূপ, কোনো ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার প্রয়োজনে যদি দূরের কোনো হোস্টেলে গিয়ে বাস করে তাকে কি স্থানান্তরিত মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে? বস্তুত স্থানান্তরকে বর্ণনা করার সময় ব্যক্তির স্থান ত্যাগের সময় নিজস্ব অভিপ্রায়কে একটা শর্ত হিসেবে মানা হয় — অর্থাৎ স্থান ত্যাগকারী মানুষের নতুন স্থানে যাওয়ার সময় স্থায়ীভাবে বসবাস করার অভিপ্রায় ছিল কি না? এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐ পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করতে যাওয়া মানুষটিকে স্থানান্তরিত মানুষ বলা যাবে না। কিন্তু ঐ ছাত্র-ছাত্রীটিকে স্থানান্তরিত মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা তা নির্ভর করে সেই শিক্ষার্থীর পাঠ শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে আসার ইচ্ছে আছে কিনা তার ওপরে।

অভিবাসক স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় নিয়েই নিজের বাসস্থান পরিবর্তন করেন। যে জায়গা থেকে ব্যক্তিটি চলে যান, সেই স্থানটিকে বলা হয় ব্যক্তির উৎস ভূমি এবং স্থানান্তরিত মানুষটিকে বলা হয় সেই স্থানের বহিঃস্থানান্তরিত ব্যক্তি। অপরদিকে অভিবাসক যেখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন সেটি হল তাঁর লক্ষ্যভূমি বা গন্তব্যস্থল এবং ঐ স্থানের ক্ষেত্রে মানুষটি আগত অভিবাসক হিসেবে বিবেচিত হন। উৎসস্থল ও গন্তব্যস্থলের বিচারে একই মানুষকে বহিঃস্থানান্তরিত ব্যক্তি ও আগত অভিভাবক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে স্থানান্তর সংঘটিত হলে এই শব্দদুটি যথাক্রমে বিদেশবাসে যাওয়া (emigration) ও বিদেশবাসে আসা (Immigration) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেখানে দুধরনের অভিবাসন প্রায়শই নিয়মিত হয় সেখানে জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

স্থানান্তরের বিশ্লেষণের জন্য সাধারণত মোট সময়টিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি মধ্যবর্তী পর্যায়ের (intervals) জন্য স্বতন্ত্রভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। স্থানান্তরের বিশ্লেষণের জন্য সাধারণত দশ বছরের পর্যায়কে ধরা হয়েছে।

অভিবাসনের কারণ সমূহ

(i) **অর্থনৈতিক ঃ** চাকরি, ব্যবসা অথবা শহরাঞ্চলে কোনো কাজের অন্বেষণের জন্য।

(ii) **সামাজিক ঃ** (ক) শিক্ষা, বিশেযত উচ্চশিক্ষার জন্য।

(খ) পরিবার স্থানান্তর ঃ যে সমস্ত মানুষ বদলির চাকরি করেন তিনি বা পরিবারের প্রধান চাকরিতে বদলি হলে অথবা অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে, তাঁর সঙ্গে পরিবারের সকলেরই সাধারণত বাসস্থানের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

(গ) বিবাহ ঃ বিবাহের কারণে স্থানান্তর; বিশেযত ভারতবর্ষের মতো পুরুষ প্রধান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মধ্যে এটি স্থানান্তরের এক স্বাভাবিক কারণ। নারীরা এখানে বিবাহের পরে তাঁর স্বামীর বাড়ি (শহরে বা গ্রামে) চলে যাবেন। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের স্থানান্তর বেশি পরিচিত দৃশ্য। সব রকম স্থানান্তরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি ঘটে।

(iii) **রাজনৈতিক ঃ** অনেক সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মানুষের মধ্যে নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যাবার ঝোঁক দেখা যায়। এই জাতীয় কারণগুলির মধ্যে আছে যুদ্ধ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা বা অশান্তি। এইসব ক্ষেত্রে মানুষ নিরাপত্তা লাভ করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহরে বা দেশে আশ্রয় নেন।

(iv) **অন্যান্য কারণসমূহ ঃ** প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেও স্থানান্তর ঘটে। স্থানান্তরের এই জাতীয় কারণের মধ্যে

বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সামুদ্রিক ঝড়, শিল্প সংক্রান্ত বিপর্যয় প্রভৃতি এই জাতীয় নানা কারণ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে স্থানান্তরের ধারা

ভারতবর্ষে আজও অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর খুব বেশি মাত্রায় হয় না। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের পর্যালোচনা করলে চার প্রকার স্থানান্তরের ধারা দেখা যায়। এই চারটি ধারা হল যথাক্রমে — (ক) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে, (খ) শহরাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে, (গ) গ্রামাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে, (ঘ) শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে। যদিও ভারতবর্ষে অভিবাসনের সংখ্যার দিক থেকে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার অনুপাত মাত্র ১/৬ অংশ, কিন্তু দুটি কারণে এর গুরুত্ব খুব বেশি। প্রথমত এটি সাধারণত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে হয় এবং দ্বিতীয়ত, এটি নগরায়ন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে।

গ্রাম থেকে গ্রামে স্থানান্তরের অপর একটি কারণ হল নতুন স্থানের শিল্পমুখী রূপান্তর। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলেই নগরায়ন বৃদ্ধি পায় যা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। এই স্থানান্তর প্রধানত চাকরির সুযোগের আশায় ও উন্নততর জীবনযাত্রার আকর্ষণে হয়ে থাকে। দুঃখজনকভাবে অনেকক্ষেত্রেই এই প্রত্যাশাগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। স্বল্পসংখ্যক মানুষই শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত হন শুধুমাত্র নিরুদ্বেগ ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাসের জন্য। সাধারণত শহর থেকে শহরে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় স্থানান্তর হয়। তবে তা ছোট শহর থেকে বৃহত্তর শহরে সংঘটিত হয়। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর সভ্যতার আদিকাল থেকেই চলে আসছে, কিন্তু বর্তমানে তা আধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আরও গতি পেয়েছে।

স্থানান্তরের ফলাফল

স্থানান্তরের ফলে মানুষ নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কিছু সুযোগ পান। যাঁরা চাকরি, শিক্ষা, ব্যবসা প্রভৃতির কারণে অভিবাসন করেন যদি তাঁদের লক্ষ্যপূরণ হয়, তাহলে তাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পরিবারের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করতে পারেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে স্থানান্তরিত মানুষ অন্যত্র এসে নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধান করেন।

যেখানে মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে আসছেন সেখানে অবশ্য এই অভিবাসনের কিছু নেতিবাচক ফলও থাকে। বর্তমানে অভিবাসনের যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তাতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে অত্যধিক অভিবাসনই হচ্ছে। তার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি হল—

(i) **বস্তি এবং অননুমোদিত বস্তি :** শহরাঞ্চলে বাসস্থানের বিশেষ অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফলে গ্রামের গরীব স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের বস্তিতে অথবা খালি জায়গা দখল করে বাস করতে হচ্ছে। অনুমান করা হয় ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণির শহরগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা এই জাতীয় বস্তি বা অননুমোদিত জায়গায় বসবাস করেন।

(ii) **জনপরিবহণে ঘাটতি :** মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনপরিবহণ ব্যবস্থা যোগান দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে অতিরিক্ত ভীড়ের চাপ, সময়মত যান না পাওয়া, সহযাত্রীদের সঙ্গে বচসা, বাসে এবং ট্রেনে বিবিধ সমাজ বিরোধী কাজকর্ম প্রভৃতি ঘটে থাকে।

(iii) **পরিকাঠামো :** যে সমস্ত শহরে এই অভিবাসকের সংখ্যা খুব বেশি, সেখানে মানুষের ন্যূনতম পরিষেবার

চাহিদাও পূরণ হচ্ছে না। যেমন পরিস্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, ভূগর্ভস্থ নর্দমা ব্যবস্থা, ময়লা বা বর্জ্য পদার্থ মুক্ত করা প্রভৃতি চাহিদাগুলিও মেটানো যায় না। এছাড়াও যথেষ্ট সংখ্যক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও অভাব থেকে যায়। শহরগুলি অভাবের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অত্যধিক মাত্রায় বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ও জলদূষণ সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় শহরগুলি যেন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। তার সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা শহরগুলিকে আরও জর্জরিত করছে। শহরের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানের অবনতি দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন

আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিশ্বস্তরে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক দেশের একটা নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। বিদেশ থেকে চলে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেশগুলি কিছু গুণমান এবং সংখ্যাগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে। বে-আইনী অভিবাসন, উদ্বাস্তুদের চলে আসা, অনুপ্রবেশ এগুলি অবশ্যই লক্ষ্যস্থল দেশের গভীর উদ্বেগের বিষয়। সেজন্য অনেক দেশই এইজাতীয় বে-আইনী অভিবাসন আটকানোর জন্য বেশ কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রয়োজনে অভিবাসকদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়েও দিয়ে থাকে। তবে উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (বিশেষত রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে) কোনো কোনো দেশ কিছু সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখায়।

অভিবাসন প্রক্রিয়া তার উৎসস্থল ও গন্তব্যস্থল উভয় সমাজেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে উভয়ক্ষেত্রেই অর্থাৎ উৎসস্থল ও গন্তব্যস্থলে জনসংখ্যার লিঙ্গ ও বয়সের বিন্যাসকে স্থানান্তর প্রভাবিত করে। অভিবাসনের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আসে। অধিকাংশ দেশেই অতি উর্বর ও অনুর্বর উভয় প্রকার জমিই আছে। আবার এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে অর্থনৈতিক বিকাশ অথবা সংকোচন দেখা যায়। বেশি জন্মহারের জায়গা থেকে কম জন্মহারের জায়গায়, সংকুচিত অর্থনৈতিক সুযোগের জায়গা থেকে প্রসারিত সুযোগের জায়গায় বেশী চাকরির সুযোগযুক্ত অঞ্চলে মানুষ চলে আসায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গণ পরিসংখ্যানগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

পশ্চিমবঙ্গ : নগরায়ন ও অভিবাসন

নগরায়ন একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নগরায়ন হয়েছে। কোথাও দ্রুত হারে, আবার কোথাও তার গতি অপেক্ষাকৃত ধীর। শিল্পোন্নত দেশগুলি এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহকে এখন শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষেও গত দু'দশক ধরে নগরায়নের মাত্রা বেড়েছে। ভারতে যেসব রাজ্যে নগরায়নের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে, এ রাজ্যে নগরায়নের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে নগরায়ন অর্থাৎ নতুন শহর গড়ে তোলার সাথে সাথে নগরোন্নয়ন বা পুরানো শহরগুলির পরিবেশগত কাঠামো বৃদ্ধির দিকেও সমান নজর দেওয়া হয়েছে।

নগরায়ন ও নগরোন্নয়ন প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্ব

ঐতিহাসিক পটভূমিকা (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) :

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ কৃষিনির্ভর গ্রাম প্রধান দেশ। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তাই এদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশ প্রধানত নির্ভর করে কৃষির উন্নতি ও অগণিত কৃষকের আয় ও জীবনমান-এর ওপর। ধারণযোগ্য নগরায়নের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রথম অংশে আমরা ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্ত বঙ্গদেশ বা বাংলার ইতিহাসের ওপর সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার ফলে গ্রামবাংলার সমাজ একদিকে মুষ্টিমেয় বিত্তবান জমিদার, অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক দরিদ্র কৃষক - এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সাধারণ কৃষকদের মধ্যে কারো কারো অল্প কিছু জমি ছিল। অন্যরা ছিলেন ভূমিহীন। তাঁরা জমিদারের জমিতে বর্গা বা ভাগচাষ করতেন, অথবা খেতমজুরের কাজ করে দিনাতিপাত করতেন। অপরদিকে জমিদাররা সাধারণত বেতনভুক কর্মীবাহিনীর মারফৎ জমিদারী চালাতেন। কৃষকদের নানাভাবে শোষণ করে তাঁরা নিজেদের আয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাঁরা ভোগবিলাসে অলস জীবন যাপন করতেন। গ্রামের বা গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির প্রতি তাঁদের কোনো দায়িত্ববোধ দেখা যেত না। অত্যাচারী লোভী জমিদার ছলে-বলে-কৌশলে অসহায় প্রজার সামান্য বসতজমি আত্মসাৎ করছেন - এমন ঘটনাও বিরল ছিল না। উদার, মানবপ্রেমী 'জমিদার' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন অপহরণের এক সজীব ছবি এঁকে রেখেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়। অবশ্য এই সাধারণ চরিত্রের কিছু শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রমও ছিল। গ্রামের কৃষকের দুর্দশা দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, গ্রামের মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করছেন - সংখ্যায় বেশী না হলেও এমন প্রজাবৎসল নির্লোভ জমিদারও ছিলেন।

গ্রামের জনসংখ্যা তো স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে চলল। চাষের জমির ওপর চাপও বাড়তে লাগল। যাঁদের যেটুকু জমি ছিল তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে খেতগুলি ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হল। এই ফসলের জমিতে ফসলের উৎপাদন ভাল হয় না। বিভিন্ন মালিকের জমির সীমানা নির্ধারণ করে দিতে কিছুটা জমি নষ্টও হয়। যেসব কৃষকের নিজস্ব জমি ছিল না, বা খুব কম জমি ছিল, তাঁরা জমিদারদের জমিতে চাষ করতেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যে ফসল তাঁরা ফলাতেন তার বড় অংশই উঠত জমিদারের গোলায়। ফসলের ভাগ বা মজুরী কোনোটাই যথেষ্ট হত না। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতেন, যত্ন নিয়ে চাষ করার প্রেরণা পেতেন না। আসলে জমির প্রতি বিশেষ মমত্ববোধও তাঁদের থাকত না। এসবের ফলে কৃষিতে উৎপাদন কমে যেত, বাড়ত কৃষকের দুরবস্থা। বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা জমিদার বা মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হতেন। সেই ঋণ সুদে-আসলে বেড়েই চলত, কোনোদিনই শোধ হত না। চিরঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবার বেগার খাটতেন।

ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার আগেই বঙ্গদেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে কয়েকটি শহরের পত্তন হয়েছিল। তখন শহরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি অবশ্য আজকের মত ছিল না। তবু জনজীবনে সেগুলির আলাদা গুরুত্ব ছিল। আর্থিক ক্রিয়াকান্ড, শিক্ষাসংস্কৃতি, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা সবই ছিল নগরকেন্দ্রিক। ব্রিটিশ শাসনকালে নতুন কিছু শহর গড়ে উঠল। বিত্তবান, আলোকপ্রাপ্ত, অভিজাত মানুষদের কাছে প্রাণচঞ্চল নগরসমূহ

হয়ে উঠল বসবাস করার আকর্ষণীয় স্থান। আবার তাঁদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে, তাঁদের রুচি অনুযায়ী উন্নত জীবনমান সুনিশ্চিত করতে শহরগুলির পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হল। শাসকদের এবং সমাজে প্রভাবশালী নগরবাসীর সমর্থনে শহরগুলি ক্রমশ হয়ে উঠল সর্বসুবিধাযুক্ত, বর্ণময়। দীন দরিদ্র গ্রাম আর ঐশ্বর্যে ঝলমল শহরের মধ্যে যে ব্যবধান প্রকট হয়ে উঠল তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তাঁর সেই বেদনা ও ক্ষোভ তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৩৩ সালে একটি অভিভাষণে। তিনি বলেছিলেন, "......শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অজ্ঞতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে বুঝলেন তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখাশীতলা; সেইখানে মাথা তুললে আরোগ্য নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ, দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।" (শিক্ষার বিকিরণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিনটি দশক (১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭) :

স্বাধীনতার শুভ লগ্নেই দেশভাগের পরিণামে আমাদের রাজ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হল। আয়তনে ছোট হয়ে আসা পশ্চিমবঙ্গকে ওপার বাংলা থেকে আসা বিরাট সংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় দিতে হল। সহায়-সম্বলহীন সব বয়সের নারীপুরুষের এই প্লাবন রাজ্যের তৎকালীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটাকে বিপর্যস্ত করে দিল। জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেড়ে গেল। এখনও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। নতুন এই জনস্রোত গ্রাম-শহর নির্বিশেষে এখানকার জমির ধারণক্ষমতাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গেল। গ্রামগুলির দৈন্যদশা তীব্রতর হল। জমির ওপর নির্ভর করে আর সংসার চলে না। রোজগারের অন্য কোনো উপায় খুঁজে নেওয়া ছাড়া গ্রামবাসীর সামনে বেঁচে থাকার আর কোনো পথ রইল না। বিকল্প জীবিকার সন্ধানে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসে বসবাস করতে লাগলেন। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করল। ওদিকে শহরগুলির পুরানো পরিকাঠামো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের বসবাসের উপযুক্ত ছিল। ক্রমাগত বাড়তি জনসংখ্যার চাপে এই ব্যবস্থা ভাঙ্গনের মুখে এসে পড়ল।

বেশী মানুষের জন্য যানবাহন বাড়ানো দরকার। কিন্তু জনাকীর্ণ শহরের ভেতর পথঘাটের সম্প্রসারণ দুঃসাধ্য। এ ব্যাপারে কলকাতা মহানগরী একটি ভাল উদাহরণ। আধুনিক নগর পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞরা বলেন কোনো বড় শহরে মোট এলাকার অন্তত ২৬ শতাংশ পথঘাট থাকা দরকার। কলকাতার ক্ষেত্রে রাস্তা আছে মাত্র ৬.৫ শতাংশ। এই কলকাতাকে সচল এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গতিশীল রাখতে হলে বর্তমান সড়ক ব্যবস্থাকে চারগুণ বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু পুরানো, বহুলাংশে অপরিকল্পিত জনবহুল মহানগরীতে যে ভাবে ঘরবাড়ী, দোকান বাজার গড়ে উঠছে তাতে এই সম্প্রসারণ কি আদৌ সম্ভব? এছাড়াও পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা জল নিষ্কাশন, আবর্জনা সরানো, বাসস্থানের যোগান দেওয়া, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতির

ব্যবস্থা করা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সুস্থতা ও ভারসাম্য রক্ষা করা - সবই দুরূহ হয়ে ওঠে। শহরের উন্নয়নের জন্য যত পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হোক না কেন, গ্রাম থেকে আসা মানুষের স্রোতে তা নগণ্য হয়ে যায়, স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং শহরগুলির দীর্ঘমেয়াদী উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গ্রামের মানুষের শহরে অভিবাসন কমিয়ে দেওয়া। এ কাজ সম্পন্ন করা যাবে যদি গ্রামের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সুসংহত উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলা যায়।

এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে গেলে প্রথমেই বিচার করতে হবে কোন্ কোন্ অভাব বা সমস্যা মেটাবার আশায় গ্রামের মানুষ শহরের দিকে পাড়ি দেন। প্রথমেই আসে তাঁদের আর্থিক দুরবস্থার কথা। আমরা জানি এরা প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভর করেন। বাড়তি মানুষের চাপে সীমিত জমিতে আয়ের সুযোগ কমে আসে। যেটুকু থাকে তা সারা বছর কোনো রকমে খেয়ে পরে বাঁচার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। যাঁদের অল্প-স্বল্প জমি আছে ঋণের দায়ে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের কাজের নিশ্চয়তা থাকে না। জমির মালিকের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। খেত মজুরদের জন্য মজুরীর কোন নির্ধারিত হার না থাকায় কাজ করে তাঁরা কত আয় করতে পারবেন তারও স্থিরতা নেই। দ্বিতীয়ত এই তীব্র দারিদ্রের জন্যই তাঁরা লেখাপড়া শিখতে বা সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন না। লেখাপড়ার জন্য পয়সা খরচ করা তাঁদের সাধ্যের বাইরে। এছাড়াও বিনাব্যয়ে সব মানুষের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার যোগান দেওয়া রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বসমূহের অন্যতম। সেই ব্যবস্থাও গ্রামাঞ্চলে প্রকটভাবে অনুপস্থিত। এমনকি পরিস্রুত পানীয় জলও গ্রামবাসীদের জোটে না। দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়াও রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্যমাত্রা থেকেও দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অবস্থাও একেবারেই সেকেলে। যাতায়াত কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। অথচ গ্রামের মানুষ জানেন এই ধরনের সব সুযোগ সুবিধাই শহরে পাওয়া যায়। তাঁদের বিশ্বাস শহরে যেতে পারলে কল-কারখানায়, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে কোনো একটি কাজ জুটিয়ে নিয়ে একটু ভাল ভাবে বেঁচে থাকা যাবে। তাই শুধু নগরমুখী উন্নয়নের ফলে গ্রাম-শহরের মধ্যে যে পার্থক্য গড়ে ওঠে তা দূর করতে না পারলে গ্রামের মানুষকে গ্রামেই থেকে যেতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আমরা দেখেছি যে গ্রামীণ দারিদ্র্যের মূল কারণ প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা। স্বাধীনতার আগে থেকেই জাতীয় স্তরে আহ্বান ছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার।' ভূমি সংস্কারের এই জরুরী কাজটিতে কিন্তু স্বাধীনতার পরেও বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি অর্পণের দাবীতে, খেতমজুরের ন্যূনতম মজুরীর দাবীতে, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করার এবং ফসলের ন্যায্য ভাগের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে বাংলার গ্রামাঞ্চলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ছিল রাজনৈতিক চাপ। ফলে ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপের আইন পাশ হল। কিন্তু সেই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় নি। আইনের ফাঁক এবং প্রশাসনিক নিশ্চেষ্টতার ফলে পুরানো জমিদার শ্রেণি বিশাল পরিমাপের জমি নানা কৌশলে বে-আইনীভাবে নিজেদের দখলে রেখে দিলেন। বাস্তবে জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল বড় জোতদারদের হাতে। তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ণ রইল। ভূমিসংস্কারের নামে এই ব্যর্থতার ফলে কৃষক সমাজের এবং অন্যান্য দরিদ্র গ্রামবাসীর অবস্থার বিশেষ কোনো হেরফের হল না।

পরের তিনটি দশক ১৯৭৭ থেকে ২০০৭:

এই তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তার তিনটি প্রধান স্তম্ভ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল -

(ক) বড় জোতদারদের দখল থেকে উদ্বৃত্ত ও খাসজমি উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এর ফলে ভারতের সব রাজ্য মিলিয়ে এ পর্যন্ত যত জমি হস্তান্তর হয়েছে তার ২২ শতাংশই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রায় ১১ লক্ষ একর জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, উপকৃত হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবার। এখন এ রাজ্যে মোট জমির ৭৮ শতাংশই রয়েছে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে। এদের বেশীর ভাগই তপশীলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু মানুষ। তাই একে বলা হয় পুনর্বন্টনমূলক ভূমিসংস্কার।

কৃষকের কাছে জমির মালিক হয়ে নিজের জমিতে চাষ করার স্বাদই আলাদা। এই জমিতে তিনি যে ফসল ফলাবেন তার সবটাই তাঁর নিজের ঘরে উঠবে, কারোকে ভাগ দিতে হবে না। এই উপলব্ধি কৃষকের মনে নিয়ে এসেছে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও কর্মোদ্দীপনা। কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থার সুফল দেখা দিল। ফসলের উৎপাদন বাড়ল দ্রুতহারে। এখন অনেক ফসলের ক্ষেত্রেই এ রাজ্য দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধির হারও জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশী।

(খ) ভাগচাষী বা বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ করা - ভাগচাষী, যাঁদের বর্গাদারও বলা হয়, তাঁরা মালিকের জমিতে চাষ করেন ফসল ভাগাভাগির শর্তে। উৎপন্ন ফসলের কত অংশ কৃষক পাবেন আর কতটা মালিককে দিতে হবে তা নিজেরা স্থির করে নেন। এই শ্রেণির কৃষকদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল নিয়মিত চাষের সুযোগ পাবার অনিশ্চয়তা। একজন কৃষক যে জমিতে ভাগে চাষ করলেন, জমির মালিক পরবর্তী চাষের সময় তাঁকে খারিজ করে অন্য কারোকে বহাল করতে পারেন। ভাগচাষীর কোন আইনগত অধিকার ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় কর্মরত সব বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা হল। অপারেশন বর্গা নামে বহুল পরিচিত এই বিরাট কর্মযজ্ঞ গ্রামজীবনে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। এই পদ্ধতিতে ১৫ লক্ষ কৃষক পেলেন বর্গাচাষের স্বত্ব। ইচ্ছেমত বর্গাদারকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা আর জমির মালিকের রইল না। অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে এই কৃষকরা চাষের কাজে অনেক বেশী উৎসাহী ও যত্নবান হয়ে উঠলেন। কৃষির উন্নতি ও গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য কমিয়ে আনার কাজে এই পদক্ষেপের তাৎপর্য এবং এ কাজে পঞ্চায়েতের ভূমিকা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হয়েছে। ইউ. এন. ডি. পি. কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৩ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "In the state of West Bengal, India, where local authorities (Panchayet) were empowered long before the National Government required all the state governments to create and empower them, poverty declined sharply in the 1980s. Under 'Operation Barga' the panchayet helped to improve agricultural technology and reform land tenancy. They also helped register 1.4 million share croppers."

(গ) খেতমজুরদের মজুরী নির্ধারণ - আর একদল কৃষক হচ্ছেন ভূমিহীন খেতমজুর। এঁরা সবচেয়ে দরিদ্র ও অসহায়। এঁরা অন্যের জমিতে দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে কাজ করেন। এই কৃষিশ্রমিকরা নিযুক্ত হন চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে - বীজ রোপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত - যেমন মালিকের প্রয়োজন। বছরের বেশ কিছু সময় তাঁরা থাকেন কর্মহীন। পারিশ্রমিক কত পাবেন সে সম্পর্কেও ছিল না কোনো বিধি-বিধান। রাজ্য সরকার

আইন করে খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করে দিল। সারাদিন কাজ করলে কত আয় হবে সে বিষয়ে খেতমজুররা নিশ্চয়তা পেলেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে শুধু আইন পাশ করেই এই সব গরীব মানুষের অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি। কৃষক সংগঠনগুলির দায়িত্বপূর্ণ উদ্যোগ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন এই কর্মসূচী সফল করতে সরকারকে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

আগে বর্ণিত মৌলিক ব্যবস্থাগুলির ফলে পশ্চিমবাংলার কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষককূল যে বিরাটভাবে উপকৃত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এর দ্বারাই সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে গেল এমন নিশ্চয়ই নয়। গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে কৃষি জমির ভাগ হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। জমির যোগান সীমাবদ্ধ। একে বাড়াবার বিশেষ অবকাশ থাকে না। এই পরিস্থিতিতে কৃষি ব্যবস্থা ও চাষের পদ্ধতি যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তবে কিছু দিনের মধ্যেই এই অর্জিত সুফলগুলি হারিয়ে যাবে। গ্রামের এবং কৃষকদের জীবন আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে যাবে। নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ কৃষকরা বুঝলেন যে কৃষির উন্নতির সঙ্গে, বেশী ফসল ফলাবার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। তাই সীমিত জমিতেই কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে নিজেরাই ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। সহায়ক ভূমিকায় রইলেন কৃষি বিশেষজ্ঞের দল ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ফসলে বৈচিত্র্য আনার পরিকল্পনা তৈরী হল। শুধু কয়েকটি প্রধান ফসলের ওপর নির্ভর না করে অন্যান্য জিনিষ চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হল। শুরু হল ধান, গম, পাট প্রভৃতির পাশাপাশি আলু, তৈলবীজ, সবজি, ফল-ফুল এবং ভেষজ উদ্ভিদের চাষ। ফসলের বৈচিত্র্য ছাড়াও জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য পঞ্চায়েতের সহায়তায় সেচ, সার, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অনেক এক ফসলী জমিকে দু'ফসলী, দু'ফসলী জমিকে তিন ফসলী করে তোলা গেছে। চাষের উপযুক্ত নয় বলে যেসব জমি ফেলে রাখা হত তারও অনেকটাই চাষযোগ্য করে তোলা হল। এইসব নতুন প্রচেষ্টায় বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। অনেকগুলি ফসলের ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে। দেখা দিয়েছে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, যার মধ্যে অগ্রগণ্য হল ফল প্রক্রিয়াকরণ। সুখের কথা, আশার কথা - আজ গ্রামবাংলার কৃষকের উৎপন্ন অনেক পণ্য বিদেশে কদর পাচ্ছে। রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থায় এই নতুন মাত্রা যোগ হবার ফলে কৃষকের আয় তো অবশ্যই বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে খেতমজুরের কাজ পাবার সুযোগ। এখন বছরের সব সময়েই মাঠে কিছু না কিছু কাজ থাকে। তাই খেতমজুররা আরো বেশীদিন কাজ পাচ্ছেন। তাঁদেরও রোজগার বেড়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে এই সব সার্থক পদক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সর্বশ্রেণির কৃষকের আয় বেড়েছে। কিন্তু আর যে বড় পরিবর্তনটি হয়েছে তা হল কৃষকদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। গ্রাম জীবনের সব ক্ষেত্রেই জোতদার-মহাজনদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্ষীণ হয়ে এলো। নির্ধারক ভূমিকায় অনেকটাই চলে এলেন কৃষকসম্প্রদায়। এইভাবেই গরীব মানুষের স্বার্থে গ্রামোন্নয়নের ভিতটি স্থাপিত হয়ে গেল। এই প্রেক্ষাপটে সার্থক ভূমিকা পালন করতে লাগল ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সম্পদ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আশাতীত সুফল এনে দিল। দারিদ্র্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ একটি ফলপ্রসূ উপায় হতে পারে কি না তা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে এটা বোঝা গেছে যে এই প্রশ্নে মূল বিবেচ্য হ'ল বিকেন্দ্রীকৃত সম্পদ ও ক্ষমতা কাদের হাতে যাচ্ছে। যে সব ক্ষেত্রে সুসংহত ভূমিসংস্কার না হবার ফলে গ্রামাঞ্চলে জোতদার-মহাজন প্রভৃতি শোষক শ্রেণির আধিপত্য রয়ে গেছে সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের

সুফল গরীব মানুষের কাছে পৌঁছবার সম্ভাবনা কম। পশ্চিমবঙ্গে পুর্নবন্টনমূলক ভূমিসংস্কারের ফলে গ্রামজীবনে কৃষকদের গুরুত্ব বেড়ে গেছে, ধনীদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে। তাই এই রাজ্যে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গরীব মানুষের উপকৃত হবার এবং সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জন করার পথ খুলে গেছে। পঞ্চায়েতকে প্রকৃত অর্থে গ্রামের মানুষের স্বশাসন ব্যবস্থায় উন্নীত করতে পারার, তাঁদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে পারার এটাই চাবি কাঠি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চ থেকেই এই উজ্জ্বল সাফল্যের সপ্রশংস স্বীকৃতি পাওয়া গেছে।

তবে এত অগ্রগতি সত্ত্বেও শুধু চাষের কাজে গ্রামের সব মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। কৃষির বাইরে অন্য কোনো জীবিকার ব্যবস্থা না করতে পারলে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় Disguised Unemployment) তীব্র হয়ে উঠবে। সুতরাং অকৃষিক্ষেত্রে বিকল্প রোজগারের সুযোগ তৈরী করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে এই ধরনের সুযোগ তৈরী হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গ্রামের মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মনে একটু ভালভাবে বেঁচে থাকার আগ্রহও জেগেছে। একটু বাড়তি পুষ্টি, ভাল পোষাক, হাত ঘড়ি, টর্চ লাইট, সাইকেল প্রভৃতি তাঁরা কিনতে পারছেন। শিক্ষার প্রসার, ব্যাপক বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রভাবে জীবনযাত্রার উন্নততর মান সম্পর্কে গ্রামের মানুষের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে, তৈরী হচ্ছে নতুন রুচি। শহুরে জীবনে পরিচিত অনেক পণ্য ও পরিষেবা তাঁরা পেতে চাইছেন। এই ভাবে গ্রামের মধ্যেই নানাবিধ পণ্যের চাহিদা বেড়ে চলেছে, দেখা দিচ্ছে জিনিষ বিক্রির নতুন দিগন্ত। একটি সরকারী হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবাংলার গ্রামের মানুষের আয় বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা। দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে শিল্প পণ্য কেনার জন্য এই গ্রামীণ জনগণ ব্যয় করছেন প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। এবং তাঁদের এই ব্যয় বছরে ১০ থেকে ১২ শতাংশ হারে বেড়ে যাচ্ছে। এই নতুন গড়ে ওঠা গ্রামীণ বাজার প্রশস্ত করছে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আনুষঙ্গিক পেশায় নিযুক্ত হবার পথ। গ্রামের মানুষই দোকান খুলছেন, তৈরী হচ্ছে সদাব্যস্ত বাজার। নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, নানারকম যানবাহন চলাচল করছে। গ্রামের সঙ্গে শহরের ভৌগোলিক দূরত্ব কমে এসেছে। অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি পৌঁছে দিয়ে গ্রামগুলিকে অনেকটাই স্বনির্ভর করা গেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করা যায়।

(ক) শিক্ষা - এই তিন দশকে এরাজ্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ৫২০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে ১ কোটির ওপর ছেলেমেয়ে। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১২ হাজারের কিছু বেশী যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫২ লক্ষ। এই সঙ্গে আছে ৫০০-র বেশী অনুমোদিত মাদ্রাসা। স্বাভাবিকভাবেই এই বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের গরিষ্ঠ অংশই রয়েছে গ্রামে। সেই সঙ্গে পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে বিকল্প প্রথামুক্ত বিদ্যানিকেতনগুলি। এর মধ্যে আছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের শাখাসমূহ। পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছেলে-মেয়েদের আর স্কুলে পড়ার জন্য শহরে যেতে হয় না। সাধারণ কলেজ ও বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও অনেক বেড়েছে। যদিও গ্রামে গ্রামে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কলেজে পড়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীদের শহরে যেতে হয়। সেগুলি বেশী দূরে নয়। যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে সেখানকার সুযোগ নেওয়াটাও কঠিন নয়। শিক্ষার এই প্রসারের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার - (১) নারী

শিক্ষার বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য আন্তর্জাতিক মহলের প্রশংসা পেয়েছে। (২) সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের কাছে শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকভাবে পৌঁছেছে। (৩) শুধু সংখ্যাগত বিস্তার নয়, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার গুণগত মানও উন্নত হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যায়।

(খ) পানীয় জল - এক সময় গ্রামের মানুষের পানীয় জলের উৎস ছিল অপরিচ্ছন্ন পুকুর, ঝর্ণা বা নদী। গ্রীষ্মকালের এর অনেকগুলিই শুকিয়ে যেত। গ্রামবাসীরা পড়তেন অবর্ণনীয় কষ্টের মুখে। রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত কর্মোদ্যোগের ফলে আজ সে চিত্র বিরল। এখন পশ্চিমবঙ্গের ৮৮.৫ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন হয় কলের মুখে না হয় নলকূপ থেকে।

(গ) স্বাস্থ্য পরিষেবা - গত প্রায় তিন দশকে গ্রামের মানুষের আয় যেমন বেড়েছে, শিক্ষা প্রসারের ভেতর দিয়ে চেতনাও সমৃদ্ধ হয়েছে। পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁরা মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গো পরিস্রুত পানীয় জলের যোগান সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষায় ও রোগ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা পালন করেছে। এর পরে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো-স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতাল। গ্রামের বিরাট সংখ্যক মানুষ এখন এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন। এসবের ফলে সাধারণ রোগের প্রকোপ কমেছে, কমেছে শিশু মৃত্যুর হার, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু।

(ঘ) বিদ্যুৎ সংযোগ - বিজলীবাতি এখন আর শুধু শহরের শোভা নয়। অনেকাংশেই এ সুযোগ গ্রামেও পৌঁছে গেছে। গৃহস্থের বাড়ীতে, চাষের খেতে, ছোট কলকারখানায়, কুটির শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা।

(ঙ) শিল্প ঃ- গ্রামে শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে মানুষের সংশয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, গ্রামেও শিল্পের প্রসার হচ্ছে এবং হওয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে কৃষির সঙ্গো শিল্পের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে হয়। গ্রামে সেই শিল্পই গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে যেগুলির কাঁচামাল আসে মূলতঃ কৃষি থেকে অর্থাৎ কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষিতে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। ধান, গমের পাশাপাশি ফল, ফুল, সজী চাষ বা অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করা হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে এগুলির যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কৃষির উদ্বৃত্ত গ্রামে শিল্পের ভিতটিকে মজবুত করেছে। এখন যেহেতু কৃষকের হাতে সামান্য হলেও অর্থ এসেছে, ফলে তার ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। তেমনি, গ্রামের সব মানুষকেই মাঠে ফসল চাষ করতে হয় না। অন্নের যোগান সুনিশ্চিত হওয়ায় এবং জমিতে সকলের কাজ না থাকায় তাঁরা এখন শিল্প কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হতে চাইছেন, কাজ খুঁজছেন। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছোট বা মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলস্বরূপ কৃষি ক্ষেত্র থেকে অকৃষিক্ষেত্রে আস্তে আস্তে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ নিযুক্ত হতে সক্ষম হচ্ছেন।

মনে রাখা দরকার যে সব ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি হলেও পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ১০০ ভাগ গ্রামেই এর সুফল সমান ভাবে পৌঁছয়নি। কিছু কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। তবে সেই ঘাটতি গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবার কারণ হয়ে ওঠে না। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে মানুষকে শহরে আসতে হয়। তবে তা সাময়িক, কয়েকদিনের জন্য। অভিবাসনের উদ্দেশ্যে নয়। এই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গো নগরায়ন ও নগরোন্নয়নের সব প্রচেষ্টার সুফলকে স্থায়ী করার মৌলিক আর্থ-সামাজিক পটভূমিকাটি তৈরী হয়ে গেল।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ন হয়েছে মূলতঃ গ্রামোন্নয়নকে ভিত্তি করে। একথা ঠিক যে, বিগত দু-তিন দশক আগে পর্যন্ত উন্নয়ন ছিল কলকাতা ভিত্তিক। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ছিল সেই পূর্বে ভারতের রাজধানী এই প্রাচীন শহর, স্বাভাবিক ভাবেই অধিকাংশ মানুষের বসবাস ও কাজকর্মের জন্য প্রথম পছন্দ ছিল। অবস্থানের কারণে, কলকাতা আজও পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। তাই কলকাতা শুধুমাত্র শহর নয়, জনসংখ্যার বিচারে তা মহানগর। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে, কলকাতা মহানগরীতে পৌর এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৯ লক্ষ। এছাড়া, এক বিশাল সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন প্রয়োজনে কলকাতায় যাতায়াত করেন। শহরের পরিষেবা ব্যবস্থার ওপর এই বিশাল সংখ্যক মানুষের চাপ পড়ে। বর্তমানে, গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেলেও একটা সময় ছিল, যখন খাদ্যের প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও মানুষ কলকাতায় আসত এবং থেকেও যেত, যাকে অভিবাসন বলে। এভাবে, কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, কলকাতা মহানগরীর আয়তনও প্রসারিত হতে থাকে। তাই, কলকাতাকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ন-এর আলোচনা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

একথা অনস্বীকার্য যে, কলকাতা মহানগরীর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ মূলতঃ অভিবাসনজনিত। এর পেছনে যেমন অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে তেমনি আছে ঐতিহাসিক কারণ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে এক বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন আশ্রয় খুঁজে নিতে। এই মানুষজনের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমিগুলির ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে, তাই কোন একটা কাজের আশায় গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত মানুষজনও কলকাতায় ভিড় করতে থাকেন। স্বভাবতই কলকাতার নগরায়নের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে অভিবাসনের ঘটনাটিও, তা দেশীয় হোক বা আন্তর্জাতিক। কাজের সন্ধানে আসা মানুষজনের একটা বড় অংশ নিযুক্ত হন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এঁরা সাধারণতঃ শহরের খুব কাছে বা কর্মস্থলের নিকটে বাস করতেই পছন্দ করেন। এভাবে শহরের প্রান্তিক অঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন বসবাসের এলাকা যা ইংরাজিতে Urban sprawl নামে পরিচিত। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য একেবারেই নেই, তাঁরা একান্ত নিরুপায় হয়ে বস্তিতে বাস করেন। আর যাঁদের বস্তিতে থাকারও সামর্থ্য নেই তাঁরা বাধ্য হয়েই ফুটপাথে, রেললাইনের ধারে বা উড়ালপথের তলায় ফাঁকা জমিটুকুতে ঝুপড়ি বানিয়ে সংসার পাতেন। শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত চাপের ফলে একদল মানুষ শহর থেকে চলে গিয়ে শহরের আশেপাশে শহরতলীতে বা গ্রামাঞ্চলগুলিতে বাস করতে শুরু করেন। এমন কি অনেক কৃষিজমিও কালক্রমে পরিণত হতে পারে বসতিস্থানে। এই প্রান্তবর্তী এলাকা বা fringe বা peripheral এলাকায় জমির দাম শহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মূল শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এভাবে চলে অপরিকল্পিত নগরায়ন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় বাসস্থানের অভাব আছে। চাহিদার সঙ্গে যোগানের এই ব্যবধান তীব্র হয়ে উঠেছে। এই ঘাটতির সুযোগ নিয়ে প্রমোটার নামক ব্যবসায়ীকূল যেখানে সেখানে জমি নিয়ে, এমন কি পরিবেশ রক্ষার জন্য অতি মূল্যবান জলাজমি ভরাট করেও বহুতল আবাসন গড়ে তুলছেন। এর ফলে অপরিকল্পিত শহরগুলির পৌর পরিষেবা সঙ্কটে পড়ে, পরিবেশের সুস্থতা বিনষ্ট হয়।

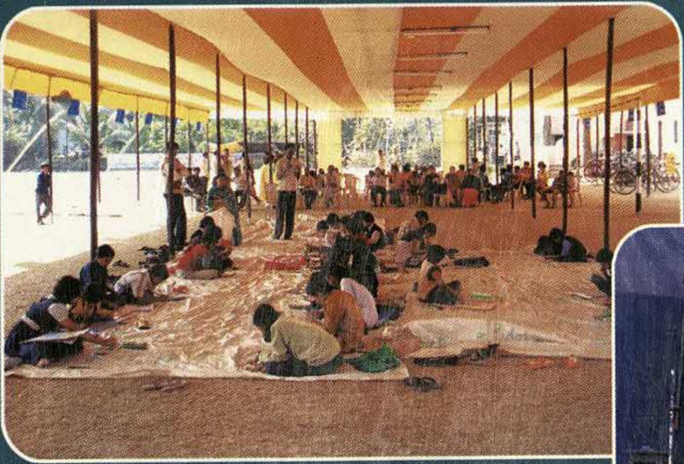
কলকাতা এক মিশ্র সংস্কৃতির শহর। এখানে একদিকে যেমন বড় বড় বাড়ি, বহুতল আবাসন রয়েছে, যেখানে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের বাস, তেমনি অপরদিকে রয়েছে স্বল্প আয়ের মানুষ, ফুটপাথ বাসী, বস্তিবাসীরা।

বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যটি বেশ স্পষ্ট। তাই নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকু ভোগ করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। যাঁদের হাতে অর্থ আছে তাঁরা যে সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারেন, অর্থনৈতিক ভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণি সেগুলি পান না, ফলে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরী হয়, তিক্ত প্রতিযোগিতা এক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। আর্থসামাজিক বিষয়সমূহে সুযোগপ্রাপ্ত ও বঞ্চিতদের মধ্যে এই অমিত্রসুলভ সম্পর্ক কালক্রমে উভয়পক্ষকে মানসিকভাবে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। একদল মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৃত্তির ক্ষেত্রে অনেকগুলি সোপান পেরিয়ে একটি উচ্চস্থানে পৌঁছে যায়। আর এদেরই প্রতিবেশীরা সবদিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। উভয় গোষ্ঠীর রুচি, নৈতিকতা, সমাজবোধ - সবই থাকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। এ যুগে বিশ্বায়ন তাড়িত প্রতিযোগিতার চাপে সকলেই অল্পবিস্তর আত্মসর্বস্ব ভোগবাদের শিকার হয়ে পড়েছে। অবক্ষয়িত হচ্ছে তাদের সংবেদনশীলতা, বাড়ছে সমাজ নিস্পৃহতা। ফলে পরস্পরের প্রতি মনোভাব বিকৃত হচ্ছে। এক পক্ষের অনুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞার বিপরীতে অন্যদের ঈর্ষামিশ্রিত সমীহ একই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। জেগে ওঠে সামাজিক অস্থিরতার আশঙ্কা। এমনকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ঘটনাও ঘটছে - শুধু আমাদের দেশে বা উন্নয়নশীল গরীব দেশগুলিতেই নয়, শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও। ফ্রান্সে এবং সংলগ্ন আরো কয়েকটি দেশে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই সংঘাতের চিত্র দেখা গেছে। অধুনা একটি প্রশ্ন সমাজ বিশ্লেষকদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তা হ'ল, এই মিশ্র জনগোষ্ঠীর নগরসমূহ সামাজিক ভাবে কতদূর ধারণযোগ্য (social sustainability of the urban areas)।

তবে এই প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বতন্ত্র। ইংরেজ শাসনের আমল থেকেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমাজের সর্বক্ষেত্রে বঙ্গদেশের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার গৌরবময় ঐতিহ্য সর্বজনস্বীকৃত। রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ মনীষীরা এবং আরো বিশিষ্ট চিন্তানায়কের অবদানে রাজ্যে একটি সহনশীল মানবিক বাতাবরণের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা উদ্যোগের মাধ্যমে বস্তিগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল, আলো-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিকাশী ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ভেতরের রাস্তাঘাট পাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে বসবাসকারী শিশুরা যাতে শিক্ষার সুযোগটুকু পায় তার জন্য পৌরসভার উদ্যোগে প্রাথমিক স্কুল তৈরী হয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ক্লিনিক, হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ঝুপড়ি বা রেললাইনের পাশে বাস করা মানুষগুলির আবাসন নিয়েও সরকারের চিন্তাভাবনা আছে। ডানকুনি, পশ্চিম হাওড়া, রাজারহাটে এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে উপনগরী তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, যেখানে বিভিন্ন আয়ের লোকেদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির বাসগৃহ পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে। অনুরূপ টাউনশিপ ব্যারাকপুর, উলুবেড়িয়াতেও ভবিষ্যতে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে কলকাতায় একদিকে যেমন লোকসংখ্যা বেড়েছে তেমনি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানবাহন। তাই সড়কপথগুলির সংস্কার কার্য জরুরি হয়ে পড়েছে। আগের তুলনায় শহরের রাস্তা অনেক চওড়া হয়েছে, বেশ কিছু উড়ালপথ নির্মিত হয়েছে, পুরানো রাস্তাগুলি সারানো হয়েছে আবার গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে অনেক নতুন নতুন সড়কপথও তৈরি হয়েছে। দূষণের মাত্রা কমাতে সবুজায়ন এর প্রয়াসটিকেও গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছে। দূষণ ছড়াতে পারে এমন কলকারখানাগুলিতে শহর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, ট্যাংরা অঞ্চল থেকে ট্যানারিগুলি (চামড়ার কারখানাগুলি) বানতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত যথাযথ ছাড়পত্র বা নির্মাণের জন্য অনুমতি পত্র না থাকলে সেই নির্মাণকার্যকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পৌরসভাও এই অনুমতিপত্র ছাড়া জলের লাইন দেয় না বা বিদ্যুৎ দপ্তর বিদ্যুতের সংযোগ করে না। রাস্তাঘাটের পাশাপাশি পয়ঃপ্রণালীগুলিরও সংস্কার করা হচ্ছে। এছাড়া দৈনন্দিন যে জঞ্জাল ও বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলিরও যথাযথ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলির যথাযথ রূপায়ণের জন্য তৎপরতা দেখানো হয়েছে। যে কোন উন্নয়নের লক্ষ্য হল স্থায়িত্ব বা sustainability। উন্নয়ন তখনই সার্থক যখন তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং আজকের উন্নয়ন আগামীদিনের সম্ভাবনা নষ্ট করে না।




জনসম্পদ বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচী২০০৭


জনসম্পদ সচেতনতা কর্মসূচী পালন
বালিকা বিদ্যালয়


জনসম্পদ বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচী২০০৭
আয়োজক-রাজ্য শিক্ষা গবেষনা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প:ব:
তরণীপুর উচ্চ বিদ্যালয়
তরণীপুর • নদীয়া।




জনসম্পদ বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচী২০০৭
আয়োজক-রাজ্য শিক্ষা গবেষনা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প:ব: